ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য

সর্বহারা বিপ্লবের আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সর্বহারা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অনুশীলন ও প্রচার। উল্লেখ করা দরকার যে, পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ও তার সঙ্গে ছেদ ঘটিয়েই সর্বহারা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এবং বিকশিত হচ্ছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদী সংস্কৃতি, নীতিনৈতিকতা ও রুচিবোধের সঙ্গে এইভাবে ছেদ ঘটিয়ে, অন্যভাবে বলতে গেলে তাকে সর্বদিকেই নিঃশেষিত করার দ্বারাই সর্বহারা সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটেছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক তত্ত্বগত প্রশ্নের বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই ভাষণ ভারতবর্ষের নবজাগরণ আন্দোলন, বিশেষত বাংলার নবজাগরণ আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার উপর আলোকপাত করেছে, আবার একই সাথে আজকের বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্যগুলিও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

বন্ধুগণ,

কবি নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজকে সভার উদ্যোক্তারা আমাকে 'ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কতর্ব্য' বিষয়ে আলোচনা করতে অনুরোধ করেছেন। নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী দিবস উপলক্ষ্যে এরূপ একটি বিষয়ের উপর আলোচনা করার আজ একটিই উদ্দেশ্য হতে পারে। উদ্যোক্তারা বোধহয় চাইছেন — কবি নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা সে সময় যে স্তরে উন্নীত হয়েছিল তার পর্যালোচনা ও যথার্থ মূল্যায়ন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সেই ধারার উত্তরসাধক হিসাবে বর্তমানে সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিযুক্ত কর্মীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয় কাজ কী হবে, তা আলোচনা করা। আমার এরকমই মনে হয়েছে।

এ বিষয়ে আলোচনা করতে হলে, আমার মনে হয়, প্রথমেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে ধারা রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুলের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রস্ফুটিত হয়েছিল, বা উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল — সেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিণতি বর্তমানে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় আমরা কী দেখছি? আজকের সমাজব্যবস্থায় তার কী পরিণতি আমরা লক্ষ করছি? সেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে তাঁদের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা, অর্থাৎ আমরা — যারা আজ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিযুক্ত রয়েছি, তারা সেই আন্দোলনের ধারাকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, বা কতটুকু তার সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছি? এই বিষয়টিই আগে আলোচনা করে দেখবার সবচেয়ে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখন দেখা যাক, দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কী অবস্থায় রয়েছে, কোন্ পর্যায়ে রয়েছে।

এর স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হলে সর্বপ্রথমে বোঝা দরকার, নজরুলরা কী ধরনের সংস্কৃতির চর্চা করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি ঘটনা ও বস্তুসত্তার মধ্যে আমরা পরস্পরবিরোধী দুটো দিক রয়েছে দেখতে পাই। মানব সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রটিও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। মানুষের সংস্কৃতির বিকাশের প্রতিটি স্তরে তাই আমরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে দুটো পরস্পরবিরোধী ধারা সবসময়ই দেখতে পাই। নজরুলদের সময়েও তাই ছিল, বর্তমানেও তাই আছে। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে ধারা গড়ে উঠেছিল, একদল সেই রাস্তায় সংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন। আর একদল এ ধারার বিরোধিতা করেছিলেন। নজরুলদের ধারায় সেদিন যাঁরা সংস্কৃতির চর্চা করেছেন, তাঁরা সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয়গান গেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পুরনো সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে হবে, পুরনো নৈতিকতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অন্ধতা — এসব ভাঙতে হবে। মানুষের নতুন প্রয়োজনে, দেশের নতুন প্রয়োজনে, নতুন মূল্যবোধের ভিত্তিতে পুরনো সমাজকে ভাঙতে হবে, নতুন করে সমাজকে পুনর্গঠিত করতে হবে। এঁদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর থেকে তখন এই সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনই

তখনকার সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে জন্ম দিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখন দেশের অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষগুলোর সামনে যে নতুন বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল, তা হ'ল — যদি দেশকে এবং জনসাধারণকে আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যদি আমরা জেগে উঠতে চাই, যদি দেশের পুনরুত্থান ঘটাতে চাই, যদি নবচেতনায়, গণতন্ত্রের চেতনায় গোটা দেশকে জাগিয়ে তুলতে হয়, তাহলে ধর্মীয় গোঁড়ামি, সর্বপ্রকার সামাজিক কুসংস্কার এবং পুরনো অন্ধতার যুগ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে নজরুল পর্যন্ত এসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভাবধারা মোটামুটিভাবে এই স্তরে একটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই ভাবধারার ঠিক ঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হলেই আমরা বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয় কাজ কী হবে, তা বুঝতে সক্ষম হব।

মূল্যায়নের মাপকাঠি

এই আলোচনা করবার আগে আমি এরই সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আর একটি বিষয় আলোচনা করে নিতে চাই। যেকোন ভাবধারা, যেকোন চিন্তা — তা প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল — এটা নির্ধারণ করবার মাপকাঠি কী হবে? কী দিয়ে আমরা বিচার করব? এর মাপকাঠি কি হবে ব্যক্তিমানসের উপলব্ধি? একজন ব্যক্তি, তা তিনি যতবড় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিই হ'ন না কেন, তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিই কি এর বিচারের মাপকাঠি হবে? একজন ব্যক্তি তাঁর নিজের মানসিক গঠন অনুযায়ী কিভাবে কোনও একটি বিষয়কে দেখছেন, উপলব্ধি করছেন, বা কী তাঁর মনে হচ্ছে — তাই কি হবে বিচারের সর্বোৎকৃষ্ট মাপকাঠি? তা যদি হয়, তাহলে প্রত্যেকটি ব্যক্তি তার নিজস্ব মানসিক গঠন অনুযায়ী যা মনে করবে তাকেই তো প্রগতিশীল বলে দাবি করবার তার অধিকার বর্তাবে। তাহলে গোটা দেশের জনসাধারণের সামনে কোন্‌টা সঠিক রাস্তা তা নির্ণয় করবার জন্য বিচারের কোন সাধারণ মাপকাঠি গড়ে তোলা কোনমতেই সম্ভব নয়। এরূপ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক নয়, ফলে গ্রহণযোগ্যও নয়। কারণ দুটো। প্রথমত প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে সত্য ধারণা একটিই এবং সবসময়েই মনে রাখতে হবে, তা বিশেষ (concrete) ও আপেক্ষিক (relative) সত্য। ফলে কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা যার যার মত করে সত্য হতে পারে না। এই কারণে জনসাধারণের সামনে বিচারের একটা 'স্ট্যান্ডার্ড' থাকা দরকার, অর্থাৎ কোন কিছু বিচারের একটা সাধারণ মাপকাঠি থাকা দরকার। আর, এই সাধারণ মাপকাঠিটি গড়ে ওঠে বিজ্ঞানসম্মত 'জেনারালাইজেশনে'র (সাধারণীকরণ) পথ বেয়ে।

সমস্ত জনশক্তিকে, সমস্ত জনমানসকে যদি সঠিকপথে প্রবাহিত করতে হয়, যে ভাবনাধারণা দেশের পক্ষে কল্যাণকর, জনতার পক্ষে কল্যাণকর, সমাজের অগ্রগতির পরিপূরক — সমাজের বেশিরভাগ মানুষকে দিয়ে যদি তা গ্রহণ করাতে হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কোন্‌টা সঠিক চিন্তাপদ্ধতি প্রথমেই তা ঠিক করতে হবে। তবেই দেশের জনসাধারণের সামনে বিচারের একটি সাধারণ ও বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠি তুলে ধরতে আমরা সক্ষম হব। সাংস্কৃতিক বিপ্লবে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের অংশগ্রহণ করার প্রশ্নটি এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

দ্বিতীয়ত, আর এক দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যাবে, ব্যক্তি-উপলব্ধি সত্য-মিথ্যা বিচারের ক্ষেত্রে সঠিক মাপকাঠি হতে পারে না। একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো সবই বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। ব্যক্তির মানসিক গঠন এবং কাঠামোটিও বিজ্ঞানের বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়। আপনি কোনও বিষয় সততার সাথে সঠিক বলে ভাবছেন বলেই সেটা সঠিক হয়ে যায় না। আপনি সততার সাথেও ভুল করতে পারেন। আপনি সততার সাথে এমন কিছু ভাবতে পারেন, যার ফলে আপনি যা চান না তাই করে বসবেন। আমি বদমায়েস লোকদের কথা, বা সুচতুর চালাকদের কথা বলছি না। যাঁরা সৎ, নিষ্ঠাবান — তাঁদের জীবনেও এ বিপত্তি বহু ঘটেছে। তাঁরা সারা জীবন দিয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য যা করা দরকার বলে ভেবেছেন ও করেছেন, ফল কিন্তু তার ঠিক উল্টো হয়েছে। অনেকে ঠিক সময় এটা বুঝতে পেরেছেন। অনেকে আবার সারা জীবন ধরেও তা বুঝতে পারেননি। এরূপ ট্রাজেডি ঘটে এইজন্য যে, তাঁরা শুধু ব্যক্তি-উপলব্ধি ও সততাকেই মূলধন করে চলতে চেয়েছেন। সততা হচ্ছে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয় যা ছাড়া কোন কাজই হয় না। প্রতিক্রিয়াশীলরাও যখন কিছু করে, নাৎসিরাও যখন কিছু করেছে, জাপানি সাম্রাজ্যবাদীরাও যখন কিছু করেছে — সততা তাদেরও দরকার হয়েছে। 'ডেডিকেশান' (নিষ্ঠা) তাদের দরকার হয়েছে। একথা

ভুললে চলবে না, জাপানেও মানুষ 'হারিকিরি' করেছে। কিন্তু, হারিকিরি করেছে তারা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য, আজ কোনও মানুষ কি তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে ? আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকটি স্বাধীনতাকামী মানুষ তাদের সভ্যতার শত্রু বলে মনে করে। তাদের কাজকে বর্বরতা বলে মনে করে। অথচ জার্মানির গেস্টাপো বা জাপানি সাম্রাজ্যবাদের যারা উদগাতা, তাদেরও ডেডিকেশান ছিল।

তাই আমি বলছি, যেকোন কাজ করার জন্য সততা, ডেডিকেশান — এটা চাই। এটা ছাড়া কোন কাজ হয় না। কাজেই এটা হলেই সব হয়ে গেল অর্থাৎ, শুধু সততা ও নিষ্ঠা থাকলেই কেউ সত্যে পৌঁছে যাবেন — এ ধারণা ভুল। তাই এটা বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোনও চিন্তা বা ভাবনাধারণা প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল — এ বিচার করবার ক্ষেত্রে কোনও মনগড়া 'ফরমুলা' (সূত্র) বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। অমুকে এই বলে গেছেন, তাই এটা প্রগতিশীল; অমুকে এটা বলে গেছেন, তাই এটা প্রতিক্রিয়াশীল — এভাবে বিচার চলে না। কারণ, যাঁরা যাই বলে থাকুন না কেন, তা বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টেকে কিনা, ধোপে টেকে কিনা সেটা আগে বিচার- বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। ইতিহাস এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের উপর ভিত্তি করে যে অভিজ্ঞতা তার সাথে মিলিয়ে আমাদের বিচার করে দেখতে হবে — কোন্‌টা প্রগতিশীল, কোন্‌টা প্রতিক্রিয়াশীল। গতির এই যে দুটো ধারা — একটা প্রগতির, আর একটা প্রতিক্রিয়ার ধারা — সাধারণভাবে সব মানুষই এটা জানে। যে গতি সামনের দিকে ঠেলে, আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে আমরা প্রগতি বলি। যে জিনিস প্রগতির পথে বাধা এবং আমাদের পিছন দিকে টানে, তাকেই প্রতিক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় অবশ্য এগোনো এবং পেছনো কথাটা আপেক্ষিক। তা সে যাই হোক্, মোদ্দা কথাটা দাঁড়াচ্ছে, কোনও কিছুই একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। কেউ যদি চেতনাকে একটা স্তরে ধরে রাখতে চায় — চেতনার কোনও একটা বিশেষ মান, যেটা আজকের অবস্থায় হয়তো খুবই উচ্চমান — সেটাকেই চিরকাল ধরে বসে থাকতে চায়, তাহলে ইতিহাসের গতিপথে দেখা যাবে চেতনার আজকের এই উচ্চমানই ভবিষ্যতে আর একটা সময়ে এসে অত্যন্ত নিচু ও অনুপযুক্ত মানে পর্যবসিত হয়েছে। কারণ, আমি আগেই বলেছি, সত্য মানেই বিশেষ (concrete) সত্য এবং আপেক্ষিক (relative) সত্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোনও কিছুরই এক জায়গায় বসে থাকবার উপায় নেই।

আপনি শত চেষ্টা করলেও আদর্শ, রুচি ও মূল্যবোধের কোন একটি বিশেষ উন্নত মানকে একটি জায়গায় ধরে রাখতে পারেন না — তা সে শরৎচন্দ্র, নজরুল, রবীন্দ্রনাথের রুচির মানই হোক্; আর বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্ট কিংবা মহম্মদ, আর মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন — তাঁদের যে কোন তত্ত্ব এবং মূল্যবোধের ধারণাই হোক্। তাকে একটা জায়গায় চিরস্থায়ী করতে গেলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়বে। আর একটি বিষয় আলোচনা করলে এই বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। মানসিকতা বলতে আমরা কী বুঝি? চিন্তা এবং ভাব কী? আমরা জানি যে, একদিকে ব্যক্তি মস্তিষ্ক ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত অপরদিকে ব্যক্তি মস্তিষ্কের সাথে তার নিজস্ব সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার দ্বন্দ্ব — এই দুই দ্বন্দ্বের ফলেই ব্যক্তিচিন্তা ও মননশীলতার বিকাশ ঘটছে। সমাজের সমস্ত মানুষের এই চিন্তাগুলির বা মননশীলতার সাধারণীকরণের (জেনারালাইজেশন) মধ্য দিয়েই সামাজিক মানসিকতার সৃষ্টি, যাকে আমরা এককথায় সমাজমনন বা সমাজচিন্তা (social thinking) বলে থাকি। একদিকে এই সমাজচিন্তার ভেতরকার দ্বন্দ্ব ও তার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি ও বহির্জগতের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই ক্রমাগত মানুষের মানসিকতার বিকাশ ও ভাবজগতের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। এই দ্বন্দ্বকে কেউই এক জায়গায় বাঁধতে পারে না। সমস্ত মানুষের মননশীলতার এই যে দুই ধরনের দ্বন্দ্ব, একে যদি এক জায়গায় বাঁধতে পারতাম, তাহলে ভাবজগতকেও এক জায়গায় বাঁধা সম্ভব হত। তাই কোন এক জায়গায় থামবার উপায় নেই। কাজেই যত প্রগতিশীল ভাবনাধারণাই হোক্ না কেন, তাকে চিরস্থায়ী করে এক জায়গায় দাঁড় করাতে গেলেই অমনি তার মানে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়, তা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।

পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে, গতি দুই ধরনের — যেটা সামনে ঠেলে তা প্রগতিশীল, আর যা আমাদের পেছন দিকে নিয়ে যায় তা প্রতিক্রিয়াশীল। আজকের সামাজিক প্রয়োজনে, অর্থাৎ প্রগতির পরিপূরক অর্থে যে আদর্শবাদ আজ সবচেয়ে উন্নত চেতনার মানকে নির্দেশ করছে — অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারা পাল্টাবার সাথে সাথে যে নতুন প্রয়োজনবোধের জন্ম হচ্ছে, তার সঙ্গে তাল রেখে যদি আমরা আমাদের ভাবনা-ধারণা, চিন্তা, আদর্শবাদ ও মূল্যবোধ — এগুলোকে ক্রমাগত পাল্টাতে ও আরও উন্নত করতে না পারি, তাহলে কী হয়? তাহলে এক সময়ের প্রগতিশীল আদর্শ, পরবর্তী

সময়ে আর একটা পরিবর্তিত অবস্থায় উৎপাদন ও জীবনপদ্ধতি পাল্টাবার সাথে সাথে নতুন প্রয়োজনবোধের মাপকাঠিতে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। ফলে, তা আমাদের ক্রমাগত নীচের দিকে টেনে নামাতে থাকে। এইভাবে সমস্ত ভাবাদর্শের মূল্যায়ন করতে হয়। এই ভাবেই আদিম সমাজ থেকে মানুষের চিন্তা ও তার ভাবজগৎ স্তরে স্তরে একটাকে ছাড়িয়ে আর একটা উন্নত স্তরে উন্নীত হতে হতে আধুনিক চিন্তা ও ভাবনাধারণাগুলির আমরা সন্ধান পেয়েছি। একথা না মানলে, আমার একটা প্রশ্নের জবাব আপনারা কেউ দিতে পারবেন না বলে আমার ধারণা। যেমন ধরুন — বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্ট, মহম্মদ — এই বিরাট মানুষগুলোর ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে মানবসমাজে উপস্থিতির কথা আমরা সবাই জানি। যাঁরা ধর্মপ্রাণ, তাঁরা অবশ্য ওঁদের ঈশ্বরের সন্তান মনে করেন, ঈশ্বর প্রেরিত দূত বলে মনে করেন, 'প্রফেট' (prophet) মনে করেন। কিন্তু যাঁরা মানবতাবাদী, আধুনিক চিন্তায় যাঁরা উদ্বুদ্ধ, তাঁরা ওঁদের বিরাট পুরুষ, অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলেই মনে করেন। আজকাল আমরা যাঁদের কথায় কথায় বড় মানুষ বলে থাকি, তাঁদের সঙ্গে এইসব বিরাট মানুষগুলোর কোনও তুলনাই হয় না। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রতিভার যে প্রমাণ তাঁরা রেখে গেছেন, আমরা কয়জন আজকের পরিস্থিতিতে তুলনামূলক বিচারে সেই প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে পারছি। তবুও একটু খেয়াল করলেই একটা জিনিস আমাদের নজরে পড়বে। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, মহম্মদের মত বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তিদের মননশীলতার দ্বারা, আজ যে আধুনিক চিন্তাধারা ও ভাবনাধারণাগুলো আপনারা লালনপালন করেন, তা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। অত্যন্ত উঁচুমানের মননশীলতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আধুনিক চিন্তা ও ধ্যানধারণাগুলোর জন্ম দিতে পারেননি। যেমন, গণতান্ত্রিক চেতনা, গণতান্ত্রিক সমাজগঠন, 'সেকুলারিজম' (ধর্মনিরপেক্ষতা), 'সেকুলার হিউম্যানিজম' (ধর্মনিরপেক্ষ বা পার্থিব মানবতাবাদ) প্রভৃতি ভাবনাধারণা ও মতাদর্শের কথা এবং এইগুলোকে ভিত্তি করে ব্যক্তিস্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা, 'লিবার্টি' ও 'ফ্রিডম' প্রভৃতি নতুন মূল্যবোধগুলোর কথা যদি ধরি, তাহলে দেখব, শিল্প বিপ্লব বা পুঁজিবাদী বিপ্লবকে কেন্দ্র করে উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টাবার সাথে সাথে এই যে সব আধুনিক ভাবনাধারণাগুলোর জন্ম হ'ল — এগুলোর কথা এমনকী স্কুলের ছাত্ররাও আজকাল অল্পবিস্তর জানে। অথচ এইসব কিন্তু বুদ্ধ, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য, যিশুখ্রিস্টের মতো প্রতিভাবানদের পক্ষেও চিন্তা করা সম্ভব হয়নি। এটা এজন্য নয় যে, প্রতিভা তাঁদের আমাদের থেকে কম ছিল, বা উচ্চ চিন্তা তাঁরা করতে পারতেন না। এরূপ ঘটার কারণ এই যে, সমস্ত মানুষের চিন্তার 'মেটেরিয়াল কন্‌ডিশান' (বাস্তব পরিবেশ) আগে তৈরি হয় তবে তার ভাবজগতের সৃষ্টি হয়। এইখানেই মানুষের চিন্তাশক্তির আপেক্ষিক স্বাধীনতার সীমা। এই সত্য যারা মানে না, তাদের আমি একটা প্রশ্নের জবাব দিতে বলব। আজকের যেসব উচ্চ আদর্শবোধ বা আধুনিক ভাবনাধারণাগুলির আমরা অধিকারী, তাঁদের চিন্তায় সেদিন কেন তা জন্ম নেয়নি? চিন্তার সীমাহীন (absolute) স্বাধীনতায় যাঁরা বিশ্বাসী, যাঁরা মনে করেন 'স্বাধীন চিন্তাসত্তা'ই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ভাবজগতের সৃষ্টি করে চলেছে, তাঁদের আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে, চিন্তাশক্তির এই স্বাধীন সত্তার ধারণা হচ্ছে মিথ্যা, অলীক। আসলে প্রত্যেকটি ব্যক্তিচিন্তারই একটা আপেক্ষিক স্বাধীনতা আছে এবং তার আবার একটা সীমাও আছে। সেই সীমাটা হচ্ছে বাস্তব পরিবেশের (material condition) সীমা।

তাহলে আমরা কী দেখছি ? আপনার চিন্তা, আমার চিন্তা, অজয়দার' চিন্তা, বা যে কোন ব্যক্তির চিন্তা — বাস্তবে আসলে এগুলো কী? কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির এই চিন্তাধারা গড়ে উঠছে? এটা বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বোঝা দরকার, সমাজচিন্তা বলতে আসলে কী বোঝায়? 'সোস্যাল থিংকিং' বা সমাজ চিন্তা বলতে আমরা একটা বিশেষ সমাজের একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শগত-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে (distinct ideological-cultural category) বুঝিয়ে থাকি — যার মধ্যেই বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা ও ভাবনাধারণার নিয়ত দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে। কেন চলছে, কীভাবে চলছে — সে সম্বন্ধে যার যা তত্ত্বই থাকুক না কেন, বহু রকমের চিন্তা যে একটা সমাজচিন্তার পরিমণ্ডলের মধ্যেই রয়েছে — সে সম্বন্ধে বোধহয় কোন দ্বিমত নেই। একটা বিশেষ পরিবেশ বা পরিস্থিতির মধ্যে নানান ভাবনা চিন্তা ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়েই আমরা একটা সমাজচিন্তার পরিমন্ডলকে বুঝিয়ে থাকি। সমস্ত মানুষের চিন্তায় সেই সমাজচিন্তারই ব্যক্তিকরণ ঘটছে, 'পারসনিফিকেশন্' ঘটছে। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজচিন্তার এই প্রকাশকেই (personified social thinking) আমরা বলি ব্যক্তি-চিন্তা। শঙ্করাচার্যের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে। যিশুখ্রিস্টের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে, মহম্মদের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে। রাজা রামমোহন রায়, নজরুল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও

বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তানায়কদের চিন্তাও এইভাবেই গড়ে উঠেছে। এর বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। মানুষের মস্তিষ্কের সাথে সমাজ পরিবেশ ও বহিঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা এটা সীমায়িত। সুতরাং, মানুষের ভাবজগৎ, অর্থাৎ মানুষের চিন্তা ও ভাবনাধারণার জগৎ বস্তু থেকেই গড়ে উঠেছে, বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। আবার মনে রাখতে হবে একইসাথে বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে তা দ্বন্দ্ব সংঘাতময়। এরকম নয় ব্যাপারটা যে, উৎপাদনের উপায় ও জীবনধারণের পদ্ধতি পাল্টাচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের মন ও ভাবনাগুলো পাল্টে যাচ্ছে। এরকম ধারণা ভুল। এরকম যান্ত্রিক নয় ব্যাপারটা। দু'য়ের সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক। যদিও বস্তুগত উৎপাদনের উপরিকাঠামো (superstructure) হিসাবেই মানুষের ভাবগত উৎপাদন বা ভাবজগৎ গড়ে উঠেছে, সমাজচিন্তা জন্ম নিচ্ছে, এই ভাবজগৎ এবং সমাজচিন্তা আবার বাস্তব পরিবেশের পরিবর্তনের ধারায় ক্রমাগত তার প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই মানুষের ভাবজগৎ একটা নির্দিষ্ট বাস্তব পরিবেশের (given material condition) পরিধিকে অতিক্রম করে যেতে পারে না — তার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। এবং পারে না বলেই অতীতের কোন মনীষীর পক্ষেই আধুনিক চিন্তা ও ভাবনাধারণাগুলির জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়নি।

অনেকে মনে করেন, অতীতের মনীষীরা যেসব মতবাদের সৃষ্টি করে গেছেন, যেহেতু তাঁরা মানুষের কল্যাণের কথা ভেবেই করেছেন এবং যেহেতু সমস্ত মানুষের জন্যই তাঁদের মনে দরদবোধ ছিল, সেইহেতু সেসব মতবাদগুলোও 'হিউম্যানিজম' বা 'মানবতাবাদ'। আজকাল বহু তথাকথিত প্রগতিশীল তত্ত্ববিদ্‌দেরও প্রায়ই এ ধরনের কথা বলতে শোনা যায়। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রগতিশীল তত্ত্ববিদ্‌রা যাঁরা তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন, তাঁদের অন্তত এরূপ বেফাঁস মন্তব্য করতে শুনিনি। কিন্তু আজকাল বহু তাত্ত্বিকের মুখ থেকে শুনি, মানবতাবাদ নাকি অতীত যুগ থেকেই রয়েছে। আমি বলতে চাই, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অনৈতিহাসিক। মানুষের ভাবজগতের বিকাশের ইতিহাসে মানবতাবাদ ও মানবতাবাদী আদর্শ বলতে সমাজ বিকাশের একটা বিশেষ স্তরের একটা সুনির্দিষ্ট আদর্শগত পরিমণ্ডলকেই বোঝায়। এইসব পণ্ডিতরা বোধহয় 'হিউম্যান ইডিওলজি' (মানবিক মতাদর্শ) কথাটার সাথে হিউম্যানিজম-কে গুলিয়ে ফেলেছেন। এদের বোঝা উচিত ছিল, যা কিছু মানবিক তাই মানবতাবাদ নয় (anything humane is not humanism)। মানুষের সমাজে যখনই যেকোন মতবাদ ও আদর্শ সৃষ্টি হয়েছে, সে আদর্শ তো মানুষের জন্যই হয়েছে। তাকে মহম্মদই সৃষ্টি করে থাকুন, চার্বাক মুনিই সৃষ্টি করে থাকুন, কপিল মুনিই করে থাকুন, আর শঙ্করাচার্যই সৃষ্টি করে থাকুন, মানুষের সমাজে মানুষের জন্যই তা করা হয়েছে — তাই এগুলো সবই মানবিক মতাদর্শ (human ideology)। কিন্তু পুঁজিবাদী বিপ্লব যে বুর্জোয়া মানবতাবাদের জন্ম দিল — সেই মানবতাবাদের সাথে অতীতের এই সমস্ত মানবিক মতাদর্শগুলোর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। এ পার্থক্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনার মধ্যে বিস্তারিতভাবে না গিয়ে একটি মাত্র বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেই বোধহয় পার্থক্যের স্বরূপটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে।

মানবতাবাদ-এর আগে গড়ে ওঠা প্রায় সমস্ত মতাদর্শগুলোই ঐশ্বরিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তাই সমস্ত মানুষের প্রতি প্রেম ও মমত্ববোধই ছিল এইসব ভাবাদর্শগুলির মূল কথা। ঈশ্বরের স্বীকৃতি থেকেই কতকগুলো মূল্যবোধের সৃষ্টি — যাকে আমরা দর্শনের ভাষায় 'প্রায়রি ভ্যালু' বা পূর্ব নির্ধারিত নীতিবোধ বলে থাকি। আর মানবতাবাদ, অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদ সেদিন যে মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল সেগুলি মূলত গড়ে উঠেছিল মানুষকে কেন্দ্র করে। মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন ও সামাজিক চেতনাই ছিল সেদিন এই মূল্যবোধের কেন্দ্রবিন্দু। ধর্মীয় ভাবধারা ও অতিপ্রাকৃত সত্তার স্বীকৃতিজনিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে এই মানবতাবাদই প্রথম মানুষের সমাজে 'সেকুলার' এবং গণতান্ত্রিক ভাবনাধারণা ও মূল্যবোধ নিয়ে এলো। সেকুলার কথাটার বাংলা মানে হচ্ছ পার্থিব। তাই সমস্ত সেকুলার ধারণার শুরুই হচ্ছে অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে (all secular concepts start with the non-recognition of any supernatural entity)। কিন্তু ভারতবর্ষে, আমাদের দেশে সেকুলার রাষ্ট্রের বর্তমানে মানে দাঁড়িয়েছে সমস্ত ধর্মে সমান উৎসাহদান। এরকম ঘটার পেছনে দেশের রাষ্ট্রনায়কদের, তত্ত্ববিদ্‌দের ও রাজনৈতিক নেতাদেরই যে মিলিত কৃতিত্ব রয়েছে — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমরা হয় অজ্ঞতাবশত ভুল করছি, আর না হয় ইচ্ছা করেই ভুলে বসে আছি যে, সেকুলার রাষ্ট্র গঠনের ধারণাটি গড়ে উঠেছিল রাষ্ট্র, সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন — সমস্ত কিছুকে চার্চের প্রভাব বা ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য। জীবন সম্পর্কিত পার্থিব গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা

(secular concept of life) এবং পার্থিব মানবতাবাদের এই হ'ল ভিত্তি। কংগ্রেসি রাষ্ট্রনায়ক ও বুর্জোয়া চিন্তাবিদ্‌দের কথা বুঝতে পারি। কিন্তু বহু তথাকথিত মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট নেতাদের চিন্তা, ভাবনাধারণা, প্রতিদিনের আচরণ ও ধর্মানুষ্ঠানগুলোর প্রতি ক্রমবর্ধমান পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে সেকুলারিজম সম্বন্ধে যে ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে সত্যিই অবাক হতে হয়। এইসব নেতারা মিলে আমাদের দেশে 'সেকুলার স্টেট'-এর মানে যা দাঁড় করিয়েছেন, তাতে যেকোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন দেখা দেবে। ইসলাম ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে বলে আমরা পাকিস্তানকে বলব ইসলামিক ধর্মীয় রাষ্ট্র (Islamic theocratic state)। আর যদি সকল ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদানই ভারত রাষ্ট্রের কাজ হয়, তাহলে তাকে একটি বহুধর্মীয় রাষ্ট্র (multi-theocratic state) ছাড়া আর কী বলা চলে ?

সেকুলার গণতন্ত্রের, সেকুলার গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূল নীতিগুলি কী? সেকুলার ভাবনাধারণা বা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার মূল নীতিগুলো গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে — একথা বোধকরি কেউ অস্বীকার করবেন না। তাহলে এটাইতো স্বাভাবিক যে, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে শিক্ষা সবসময় ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরবে। যদি সত্যসত্যই ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মর্যাদা দিতে চাই তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই ধর্মীয় ভাবধারার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে। কিন্তু আমরা আমাদের এই তথাকথিত সেকুলার রাষ্ট্রে বাস্তবে কী দেখছি? শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করা তো দূরের কথা, শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় প্রভাব, শিক্ষানুষ্ঠানগুলিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আধিক্য, এমনকী পাঠ্যপুস্তকগুলিতে ধর্মীয় প্রচার দিনের পর দিন ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের দাবিতে যাঁরা আজ আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তাঁদের প্রথমেই দুটো জিনিস পরিষ্কার করে বুঝতে হবে। প্রথমত শিক্ষাকে ধর্মীয় ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত শিক্ষা সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি — পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্তির জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণের প্রতিদিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে লড়াই চলছে — তার পরিপূরক কিনা বিচার করে দেখতে হবে। এ দু'টি মাপকাঠির ভিত্তিতেই শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষাব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোন একটি আন্দোলন প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল — তা বিচার করে দেখতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার সংস্কার নিয়ে বহু কমিশন বসেছে। এই সব কমিশনগুলো শিক্ষা ব্যবস্থার নানান খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা সুপারিশে ভর্তি করে ফেলেছে। কিন্তু সমস্যাটির আসল জায়গায় ঘা দেওয়া এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই আজ দেশের অভ্যন্তরে নৈতিকতার অধঃপতনের আসল কারণটি নেতারা কেউই ঠিকমত ধরতে পারছেন না। বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি ও অনেক রাজনৈতিক নেতাদের ধারণা, আমরা সব ঠিকমত আচরণ করছি না, তাই এরকম কাণ্ড হচ্ছে। যাঁরা সৎ, যাঁরা সত্যিই সমস্যাটা ধরবার চেষ্টা করছেন, যাঁরা ভাবছেন মানুষগুলো ঠিকমত আচরণ করছে না, ব্যক্তিগত আচরণবিধি নেই, — সত্যিই নেই — রাজনীতিতে নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেই, প্রশাসনে নেই, আমি তাঁদের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। এটা যে নেই একথা সবাই অনুভব করছেন, আমরাও করছি। কিন্তু নেই কেন? এই তো সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তোমরা নেতারা ছাত্রদের বলেছিলে, 'ফ্লাওয়ার্স অব্ বেঙ্গল'। তারা দলে দলে 'ক্যারিয়ার' ছেড়ে, কোন পিছু ডাকে কান না দিয়ে তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে দেশের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মাস্টারমশাইদের সেদিন আদর্শ পুরুষ মনে করত ছাত্ররা। আজকে তাঁদের মনে করে না কেন? সেইসব ছাত্র কোথায় হারিয়ে গেল? তাহলে কি এ কথাই মানতে হবে, তখন ঈশ্বর আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই আমাদের সব ঘরে ঘরে সুপুত্র পাঠাতেন, এখন আমাদের প্রতি বিগড়ে গেছেন কাজেই বেছে বেছে যত কুপুত্র আমাদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছেন? আপনারা নিশ্চয়ই কেউ এভাবে ভাবেন না। তাহলে গোটা দেশের মানসিকতা বিগড়ে গেল কী করে? নৈতিকতার মান ক্রমাগত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে কেন? আমরা তো নৈতিকতার মান বাড়াতেই চাইছি। আমরা তো বলছি, দেশকে রক্ষা কর, পরিশ্রম কর, সৎ হও। কিন্তু, যত বলছি সৎ হও, পরিশ্রম কর, তত মানুষ মোটা অর্থে প্রয়োজনবাদী হয়ে পড়ছে। কিন্তু, কেন ?

এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয়ও আলোচনা করতে চাই। আমি লক্ষ্য করছি, আজকাল আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োজনবাদ বা 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম'-এর প্রভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। মার্কসবাদ এবং বিজ্ঞান যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা

বলে — এই প্রয়োজনবাদ বা প্র্যাগ্‌ম্যাটিজম্‌ তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ যে মোটা অর্থে প্রয়োজনবাদ-এর প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে, তা হয়তো মার্কসবাদের বিকৃতি থেকেই শুরু হয়েছে। কারণ তথাকথিত প্রগতিশীল, মার্কসবাদী এবং সমাজতন্ত্রীদের মধ্যেই এই বিচ্যুতিটা আমি বেশি লক্ষ করছি। অনেক মার্কসবাদী, মার্কসবাদের প্রয়োজনতত্ত্বকে প্রয়োগ করতে গিয়ে মোটা অর্থে প্রয়োজনবাদী হয়ে পড়েছেন। আশু প্রয়োজনবোধ মানুষের যথার্থ প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করছে কিনা, অর্থাৎ তা সমাজপ্রগতি, শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী চেতনা ও বিপ্লবের পরিপূরক কিনা, এ সব বিচার করে দেখবার এদের অবকাশ নেই। মার্কসবাদ যে প্রয়োজন বা 'নেসেসিটি'র কথা বলছে, বিজ্ঞান যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলছে, সে প্রয়োজনবোধ হচ্ছে প্রগতি এবং সমাজ কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজন। সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের বিকাশ ও অগ্রগতির মধ্য দিয়ে বিপ্লবী চেতনার ক্রমঅভিব্যক্তির পথে ব্যক্তির যথার্থ বিকাশ এবং উন্নতির পরিপূরক যে প্রয়োজনবোধ — তাই হচ্ছে মার্কসবাদ ও বিজ্ঞানের অর্থে প্রয়োজনবোধের স্বীকৃতি (recognition of necessity)। এ প্রয়োজনের সাথে হামেশাই ব্যক্তির সাময়িক প্রয়োজনবোধের বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে। এ প্রয়োজনের সাথে কখনও কখনও রাজনৈতিক পার্টির আশু প্রয়োজনবোধের বিরোধ হতে পারে। তখন সেই বিরোধে পার্টির এরূপ প্রয়োজনবোধকে আমাদের দমন করতে হবে। অথচ বর্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে প্রয়োজনবাদের প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে, তাকে এককথায় বলা যায় প্র্যাগম্যাটিজম্‌ বা নিকৃষ্ট ধরনের প্রয়োজনবাদ। আজকাল কাগজে-পত্রে প্রায়ই অনেক পণ্ডিতব্যক্তিদের আলোচনা করতে দেখা যায় যে, "ওরা বড় কল্পনা বিলাসী (utopian), ওদের দৃষ্টিভঙ্গি একটু 'প্র্যাগম্যাটিক' হওয়া দরকার।" এই সব কথা শুনে মনে হয়, প্র্যাগম্যাটিজম বা প্রয়োজনবাদ যে অতি নিকৃষ্ট ধরনের ভাববাদী দর্শন, তা হয় এঁরা জানেন না, না হয় ইচ্ছে করেই এরূপ ভুল করছেন। প্রয়োজনবাদী বিবেচনা (pragmatic consideration) কথাটিকে রাজনৈতিক পরিভাষায় সোজা করে বললে দাঁড়ায় সুবিধাবাদী বিবেচনা (opportunist consideration)। এরা আসলে 'প্র্যাকটিক্যাল' কথাটির সাথে 'প্র্যাগম্যাটিক' কথাটিকে গুলিয়ে ফেলেছেন। এদের জানা উচিত ছিল যে, বিজ্ঞানের ভাষায় যা 'প্র্যাকটিক্যাল কনসিডারেশন' তা প্রয়োজনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিরোধী ; তা সত্যকে প্রতিফলিত করে না। সেটা প্রয়োজন সম্বন্ধে অসত্য ধারণা। এই প্রয়োজনবাদ দেশের সর্বনাশ করছে। এরূপ প্রয়োজনবাদের প্রভাব বৃদ্ধি সমাজের মানুষগুলোকে ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলছে এবং গণআন্দোলনের প্রাণশক্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

এই সব বিষয়গুলোর আলোচনার দ্বারা আমি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমস্যাগুলোর স্বরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে একটা বিচারের মাপকাঠি তুলে ধরতে চাইছি। এইসব আলোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর নির্ভর করে কোন আন্দোলন, তা সে সাংস্কৃতিক আন্দোলনই হোক বা রাজনৈতিক আন্দোলনই হোক, তা প্রগতিশীল কি প্রতিক্রিয়াশীল, তা নির্ধারণ করতে গেলে ভুল হবে। আমাদের বিচার করতে হবে ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের আলোকে এবং ইতিহাস ও যুক্তিবিজ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে যে অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতাকে তার সাথে মিলিয়ে। বিচারের এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে আমরা যদি রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করতে চাই, তাহলে প্রথমেই যে পরিস্থিতিতে ঐ সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে তা আমাদের বোঝা দরকার।

ভারতে নবজাগরণের সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমি ও তার দু'টি ধারা

ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রই জানেন যে, পুঁজিবাদের বিকাশের পথেই সমস্ত আধুনিক জাতিগুলির (nations) ও জাতীয় রাষ্ট্রগুলির (national states) সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয়তার উন্মেষ ও বিকাশও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। আজ যাকে আমরা দেশাত্মবোধ বলছি, এরূপ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি বেশিদিনের কথা নয়। অতীতের ভারতবর্ষে এরূপ দেশাত্মবোধ ছিল না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তা সম্ভবও নয়। একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে জাতীয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ না হলে এরূপ দেশাত্মবোধের সৃষ্টি হতে পারে না। ভারতবর্ষ সমস্ত উপজাতিগুলিকে (nationalities) মিলিয়ে একটা আধুনিক জাতি (nation) হিসাবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ঢুকেছে সারা দেশ জুড়ে একটি কেন্দ্রীয় ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পরে। এই সময় থেকেই একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনে সারা দেশ জুড়ে রেল ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এবং তারই ফলে ধীরে ধীরে স্থানীয় গ্রামীণ

অর্থনীতিতে ভাঙন শুরু হয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় অর্থনীতিগুলিকে মিলিয়ে সারা দেশ জুড়ে ব্যবসাবাণিজ্যের কাঠামো (trade and commerce system) গড়ে উঠতে থাকে। এই পথেই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে একটি জাতীয় বাজারের সৃষ্টি হতে থাকে এবং জাতীয় পুঁজি জন্ম নেয়। আধুনিক যানবাহন ব্যবস্থার বিস্তৃতি লাভ, বিভিন্ন উপজাতীয় অর্থনীতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময়, একটি জাতীয় বাজারের সৃষ্টি ও পুঁজিবাদের বিকাশ ভারতবর্ষে সমস্ত উপজাতিগুলির মধ্যে একটি সমস্বার্থবোধ এনে দেয়। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক এই সমস্বার্থবোধই গোটা ভারতবর্ষে একটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে সমস্ত উপজাতিগুলিকে (nationalities) একসূত্রে বেঁধে ফেলল। তাই আমরা দেখতে পাই ভারতবর্ষে মারাঠি, বাঙালি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি কোন উপজাতিই এককভাবে আলাদা জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেনি। এরূপভাবে ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার স্ফূরণ হয়নি। হতে পারত, কিন্তু হয়নি ব্রিটিশের শাসনের কারণে। যাই হোক, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভারতের সমস্ত উপজাতিগুলি মিলে একটি আধুনিক জাতি গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া শুরু হল, গোড়া থেকেই তার মধ্যে কতকগুলো দুর্বলতা থেকে গেল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে মেলাতে সক্ষম না হওয়ার ফলে গোটা জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কতকগুলি দুর্বলতা থেকে গেল। জাতীয় আন্দোলনকে আমরা ধর্মীয় ভাবনাধারণা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে সমর্থ হইনি। তাই স্বাধীনতা লাভের পর রাজনীতিগতভাবে আমরা একটি আধুনিক জাতি হিসাবে গড়ে ওঠলেও ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচারকে ভিত্তি করে আমাদের দেশের জনসাধারণ বিচ্ছিন্ন ও আলাদা আলাদা সম্প্রদায় হিসেবেই থেকে গেল। তাই জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে সর্বত্র একই গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও আচরণবোধ গড়ে ওঠার পরিবর্তে উপজাতীয় মানসিকতার নানান জটিলতা (mental complex) আমাদের জাতীয় চেতনার মধ্যে মিশে গেল।

এদেশে এরূপ ঘটার প্রধান কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী। ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ ও জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সৃষ্টি এমন একটা সময়ে হল যখন বিশ্বপুঁজিবাদ তার সমস্ত প্রগতিশীল চরিত্র হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদে পর্যবসিত হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় পুঁজিবাদ তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হলেও ঐ ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অংশবিশেষ। তাই পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদের যে বিপ্লবী চরিত্র ছিল, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের যুগে ভারতীয় পুঁজিবাদের সেই বিপ্লবী চরিত্র আর ছিল না। তাই ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিলেও আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর অংশ হিসাবে তাদের বিপ্লবী চরিত্র ছিল না, তারা মূলত হয়ে পড়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী বিরুদ্ধবাদী (reformist oppositional)। ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে আমরা বুর্জোয়া মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী দু'টি ধারা দেখতে পাই। একটি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সাথে আপসমুখী এবং গোটা আন্দোলনে এইটিই মুখ্য ধারা ছিল। অপরটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের ধারা।

যদি রামমোহন থেকে নজরুল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা ও গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, অনুরূপভাবে মানবতাবাদী ভাবনাচিন্তার এই দুটি ধারা এদেশের সাহিত্য-চিন্তায়ও প্রতিফলিত। শরৎচন্দ্র, নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ — এই তিনজনকে নিয়ে ভারতবর্ষের মানবতাবাদী ভাবধারার পুরোপুরি একটা 'ক্যাটিগরি' আমরা পাই। সাংস্কৃতিক ভাবধারার এই পুরো ক্যাটিগরিটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখব, এর মধ্যে দু'টি ধারা পাশাপাশি মিশে রয়েছে। একটি ধারা 'অ্যাগনস্টিক' অর্থাৎ অজ্ঞেয়বাদী — ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে তর্ক করে না, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, মূল ঝোঁক বা প্রবণতা হচ্ছে বস্তু ও বাস্তবজগতটাকে বিশ্বাস করার দিকে। ফলে এর দৃষ্টিভঙ্গি মূলত 'সেকুলার'। সাহিত্যচিন্তায় এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন শরৎচন্দ্র ও নজরুল। আর একটি ধারা ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবতাবাদের মূল্যবোধগুলির সংমিশ্রণ করতে চেয়েছে। এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মূলত রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মানবতাবাদী আন্দোলন যখন পূর্ণ আকার ধারণ করল তখন এই দু'টি ভাবধারাই আমাদের দেশের সাহিত্যচিন্তার মধ্যে, দর্শনচিন্তার মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে পাই। এরূপ ঘটল কেন ভারতবর্ষে? পুরো মানবতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে এই দুটো ধারা দেখা গেল কেন? একটা যৌবনোদীপ্ত মানবতাবাদ, আপসহীন, সেকুলার, অজ্ঞেয়বাদী—শেক্সপিয়ারের সময়ের বা রেনেসাঁর মানবতাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক

সুর যার মধ্যে ধ্বনিতহচ্ছে, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের মধ্যে যেটা আমরা প্রতিভাত দেখতে পাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ যিনি গোটা মানবতাবাদী আন্দোলনে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন এবং এঁদের চেয়ে অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে গোটা সাহিত্যজগৎ ছেয়ে আছেন —তাঁর ভাবনাধারণা ও চিন্তাধারার মধ্যে সেই যৌবনোদীপ্ত ও বিপ্লবী 'ফারভার' (উত্তাপ) নেই। তিনিও কিন্তু মানবতাবাদী চিন্তা ও মূল্যবোধের একই সুর প্রতিধ্বনিত করেছেন; সেই 'লিবার্টি' (স্বাধীনতা), 'ম্যান'-কে (মানুষকে) কেন্দ্র করে সেই 'হিউম্যানিস্ট ভ্যালু'-র, সেই 'ফ্রিডম'-এর জয়গান — সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। অথচ অতি সূক্ষ্মভাবে এরই সাথে মিশে রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। এর দ্বারা আমি মোটা অর্থে ধর্ম বা ধর্মান্ধতার কথা বলছি না। আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব, অর্থাৎ 'স্পিরিচুয়ালিজম'-এর সঙ্গে মানবতাবাদী মূল্যবোধের একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। এই সংমিশ্রণ ঘটাতে গিয়ে এদেশের মানবতাবাদ জরাগ্রস্ত ও পঙ্গু হয়েছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনেও তাই আমরা গণতন্ত্রের ভাবনাধারণার সঙ্গে ধর্মীয় এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলির একটা আপস (compromise) করে নিয়েছি। ধর্মের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিনি। ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করে আমরা জাতীয়তা এবং জাতীয়তাবোধের নতুন ভাবধারাগুলিকে সামনে নিয়ে আসতে পারলাম না। ফলে জাতীয়তাবাদ মূলত ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হয়ে পড়ল এবং এরূপ অবস্থায় অতি স্বাভাবিকভাবেই এই আন্দোলনে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য থেকে গেল। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিলেন, গণতান্ত্রিক ভাবনাধারণার কথা যত সুন্দর করেই তাঁরা বলুন না কেন, এই কারণেই ভারতবর্ষের মুসলিম সম্প্রদায়ের জনগণকে তা স্পর্শ করতে পারল না। বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্ব যাঁরা ছিলেন, ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যাঁদের কোন বিদ্বেষ ছিল না — যেমন গান্ধীজি — তাঁরা অনেকেই বহু প্রভাবশালী মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনে টেনেছিলেন। যেমন, আবদুল গফুর খান, যাঁকে আমরা সীমান্ত গান্ধী বলি, ডাক্তার খান সাহেব, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং আরও খ্যাত-অখ্যাত অনেকে জাতীয় আন্দোলনে এসেছিলেন। কিন্তু গোটা মুসলমান সমাজকে আমরা নাড়া দিতে পারলাম না। তাদের সংশয় আমরা দূর করতে পারলাম না। কেন পারলাম না? শুধু কি তাই? আমরা হিন্দু সমাজের জাতপাতকেও দূর করতে পারলাম না, ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করতে পারলাম না। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এত বড় একটা জাতীয় উত্থান হল, কিন্তু তার ধাক্কায় আমরা সামাজিক বিপ্লবের কাজটিকে পর্যন্ত সম্পন্ন করতে পারলাম না। 'সিডিউলড কাস্ট ফেডারেশন' জন্ম নিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব মূলত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বর্ণ হিন্দুদের হাতে ছিল। আমরা সবাই 'কমরেড' হয়ে ময়দানের সভায় যোগ দিতাম এবং লড়াই করতে যেতাম কিন্তু নিম্ন বর্ণের ও মুসলিমদের অন্দরমহলে ঢুকতে দিতাম না। তুমি নিম্নবর্ণের লোক, আমি ব্রাহ্মণ; তোমার জন্য আমি জান দিতে পারি, তুমি আমি 'কমরেড', স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের জন্য লড়ছি, ময়দানে একত্রে বক্তৃতা করতে পারি, একে অপরের জন্য মরতে পারি, কিন্তু খবরদার! আমার মেয়েকে তোমার ভালবাসার অধিকার নেই। তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ হতে পারে না। সেখানে জাত দেখেই তার বিয়ে দিতে হবে। ব্যক্তিগত আচরণে দু'চারজন নেতা এর ব্যতিক্রম ছিলেন, এর থেকে মুক্ত ছিলেন। যেমন গান্ধীজি, সি আর দাস, সুভাষচন্দ্রের মতো কিছু নেতা ও বিশিষ্ট মানুষ এর থেকে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাতে কী হবে? তাঁরা নিজেরা সত্যসত্যই চেষ্টা করেছিলেন এই জাতপাত ভাঙার জন্য, চেয়েছিলেন 'অস্পৃশ্যদের' সঙ্গে নানান জাতের বিবাহ হোক। গান্ধীজি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে এটা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কী হবে ? সমাজগত আন্দোলনে তার প্রভাব কতটুকু ছিল? স্বাধীনতা আন্দোলনে যাঁরা দলে দলে সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়েছেন বা যাঁরা আন্দোলনগুলিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের জীবনে তার প্রভাব কতটুকু পড়েছিল? কারণ জাতীয় মানসিকতার এই জট ছাড়াবার জন্য আদর্শগত দিক থেকে গোটা ভাবগত আন্দোলন এর গোড়া ধরে নাড়া দেয়নি। একাজ করতে হলে, দেশের এই কূপমণ্ডুকতা এবং সামন্ততান্ত্রিক বিভেদ ও ভাবধারাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে হলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে রাজনৈতিক বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা সর্বপ্রথম জরুরি কাজ ছিল। কিন্তু গোটা আন্দোলনের নেতৃত্ব সংস্কারবাদী জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে থাকার দরুন একাজ করা সম্ভব হয়নি।

তাই, রাজা রামমোহন রায় যে ভাবধারা আনলেন, বিদ্যাসাগর যাকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়ে গেলেন এবং শরৎচন্দ্র, নজরুল সামাজিক বিপ্লবের যে ঝান্ডাটিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, রাজনৈতিক

আন্দোলনে সেটিকে আমরা অবহেলায় ফেলে দিলাম। আমরা একপেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেশায় মশগুল হয়ে এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝান্ডাটিকে ফেলে দিলাম। আমাদের দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এই দুর্বলতা — যা আমরা রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির চিন্তাধারার মধ্যে দেখতে পাই, তার কারণ এই নয় যে, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে দুর্বল ছিলেন বা কম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। এরূপ ভাবলে সমস্যার গুরুত্বকে ছোট করে দেখা হয়। কারণ একথা কিছুতেই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এঁরা দু'জনেই বিরাট প্রতিভাধর পুরুষ ছিলেন। তবুও তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে এ দুর্বলতার কারণ — তাঁদের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণীর চিন্তাভাবনার ব্যক্তিকরণ ঘটেছে — অর্থাৎ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁরা যে শ্রেণীর ভাবনাধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তা হচ্ছে ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এবং এই শ্রেণীর ভাবনাধারণাগুলি তখন প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে, অর্থাৎ তাতে ক্ষয় ধরেছে; তা সমাজপ্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন আন্তর্জাতিক ভাবগত আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটা আন্দোলন ছিল না, সেহেতু শ্রেণীসংগ্রামকে ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে ভাবগত সংঘর্ষ চলছিল এবং সেদিন বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভাবগত জীবনে যে ক্ষয় ধরেছিল, ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা ঐতিহাসিক কারণেই সম্ভব ছিল না।

পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগে — আমাদের পরিভাষায় যাকে আমরা গণতান্ত্রিক বিপ্লব, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলি — মনে রাখতে হবে, সেই বিপ্লবের পরিপূরক হিসেবেই বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবনাধারণাগুলির জন্ম হয়েছিল। তাই সেদিন মানবতাবাদের ভাবনাধারণাগুলি ছিল বিপ্লবাত্মক। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে ব্যক্তিসম্পত্তি ও ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদী বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল। এই অর্থে একে ব্যক্তির বিকাশের বিপ্লবও বলা চলে। তাই বুর্জোয়া সমানাধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মুক্তি — এই স্লোগানগুলিকে ভিত্তি করেই এই বিপ্লব ধর্মীয় ও সামাজিক সর্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়েছে, চার্চের আধিপত্য ভেঙেছে, ভূমিদাসদের মুক্ত করেছে, মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতা দিয়েছে, নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে। ফলে বুর্জোয়াশ্রেণীর মতবাদ হলেও মানবতাবাদ সেদিন ছিল বিপ্লবাত্মক, তা দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা, অভূতপূর্ব 'টেকনোলজির' উন্নতি, কৃষির আধুনিকীকরণ প্রভৃতির দ্বারা সমাজজীবনে ও অর্থনৈতিক জীবনে একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনে দিল। কিন্তু গণতন্ত্রের নামে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন, ব্যক্তিগত মালিকানাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা ও শোষণমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সেই পুঁজিবাদ কিছুদূর এগিয়ে—যে মানুষগুলোকে সে নিজেই একসময় সামন্ততান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিল, তাদেরই শোষণ করতে করতে তাদের কেনবার ক্ষমতাকে নষ্ট করতে আরম্ভ করল ও ধীরে ধীরে একচেটিয়া পুঁজিবাদের জন্ম দিতে থাকল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই পুঁজিবাদ নিজেই তার বাজার সংকট সৃষ্টি করে বসল। যেই একচেটিয়া পুঁজিবাদের জন্ম হতে থাকল, তখন থেকেই সে বাজার সংকট সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল এবং সেই থেকেই সে বিদেশের বাজারের দিকে হাত বাড়াতে লাগল। পুঁজিবাদ মাত্রই এইরকম। প্রথমে যখন সে গড়ে ওঠে, তখন গড়ে ওঠে জাতীয় চেতনা নিয়ে, মানবতাবাদ ও গণতন্ত্রের চেতনায় জাতি গঠনের উদ্দেশ্যে। গোটা জাতির জীবনযাত্রার আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাষ্ট্র এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে পুঁজিবাদ প্রথম আসে। কিন্তু এইটে কায়েম হওয়ার পরেই ধীরে ধীরে একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দেয় ও নিজেই নিজের সংকট ডেকে আনে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের বাজারের দিকে হাত বাড়ায়, 'কসমোপলিটানিজম'-এর দিকে এগোয় — 'ইম্‌পিরিয়ালিজম'-এর জন্ম দেয় — সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়। **এইভাবেই বিশ্বপুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদে পর্যবসিত হয়েছে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিপ্লবটা যখন আর বিপ্লব নেই, প্রতিক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়ে পুঁজিবাদ যখন সমাজপ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞান ও উৎপাদিকা শক্তিকে হ্রাস করছে, তার ওপর গতিহীনতার** (stagnation) **প্রবণতা চাপিয়ে দিচ্ছে, সেই সময় থেকেই অতীতের বুর্জোয়া মানবতাবাদও ধর্ম ও সর্বপ্রকার কুসংস্কারের সাথে আপসমুখী হয়ে পড়েছে।**

বিশ্বপুঁজিবাদের এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ — জাতীয়তাবোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা এবং এদেশের মানবতাবাদের জন্ম। ফলে বিশ্ব পুঁজিবাদী শ্রেণীভাবনাধারণার অংশ হিসেবেই এদেশে এগুলো এলো বলে শুরু থেকেই এর ভেতরে পাশাপাশি দুটো

ধারা আমরা দেখতে পাই। পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগের — রেনেসাঁর সময়ের মানবতাবাদের বিপ্লবাত্মক ভাবধারাগুলোও এলো, আবার ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী যুগের জরাগ্রস্ত মানবতাবাদ — যা ধর্মের সঙ্গে আবার আপস করতে চাইছে, আবার জাতিবিদ্বেষের চর্চায় (racialism) ফিরে যেতে চাইছে, অধ্যাত্মবাদের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে — সেই জরাগ্রস্ত মানবতাবাদী চিন্তাধারাও একই সাথে এসে গেল। দু'টি ভাবধারাই এদেশে এসে গেল। একটি হচ্ছে, বিপ্লবাত্মক যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদ যার প্রকাশ ঘটেছে নজরুল এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে। আর একটি হচ্ছে, বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত মানবতাবাদী চিন্তাধারা যার প্রকাশ রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যে, রবীন্দ্রনাথের ভাবজগতে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে — যদিও রবীন্দ্রনাথ এঁদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যাপ্তি নিয়ে আমাদের দেশের মানবতাবাদী চিন্তাজগৎ ছেয়ে আছেন। তাই একজন সৃষ্টি করেন 'পথের দাবী', আর একজন 'চার অধ্যায়'। একজন 'কমলে'র সৃষ্টি করেন, আর একজন 'লাবণ্যে'র সৃষ্টি করেন। একজন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করেছেন — যুক্তির ভিত্তিতে যা কিছু পুরনো এবং অতীত তাকে ভাঙো, নৈতিকতা যুক্তিহীন হতে পারে না, কোথাও একটা জায়গায় দাঁড়ানোর উপায় নেই; প্রগতির রাস্তায় যদি পদক্ষেপ করতে হয় তাহলে প্রতিনিয়ত মূল্যাবোধগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, থামতে তুমি পার না। আর একজন স্থিতিলাভ করতে চেয়েছেন, 'শাশ্বত সৌন্দর্যে'র আড়ালে একটা জায়গায় দাঁড়াতে চেয়েছেন। তাই তার ভালবাসা বাস্তবে লাবণ্যের জীবনে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। কেননা বাস্তব জীবনটা তার সঙ্গে শত্রুতা করে। তাই তার প্রেম 'প্লেটনিক' বা কাল্পনিক। বাস্তবে তিনি যান মশলা পেশার প্রয়োজনে আর একজনকে বিয়ে করতে; আর তার প্রেম — যাকে তিনি পবিত্র, ঐশ্বরিক বলে মনে করেন, তা হচ্ছে শিকেয় তুলে রাখবার জন্য, কল্পনা করবার জন্য। শরৎচন্দ্র মনে করতেন, জীবনসংগ্রাম ও শ্রেণীসংগ্রাম—মানুষের স্নেহ, প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার মতো অনুভূতিগুলিকেও ক্রমাগত প্রভাবিত করছে; আর রবীন্দ্রনাথ প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার মতো অনুভূতিগুলিকে স্থানকালের ঊর্ধ্বে শাশ্বত সৌন্দর্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তাই শরৎচন্দ্র ছিলেন বাস্তববাদী (realist), দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে যিনি জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, তাই তিনি ছিলেন জীবনদ্রষ্টা ও রসস্রষ্টা। তাই সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। আর একজন তত্ত্ব ব্যাখ্যা ও অপূর্ব বচনভঙ্গির আড়ালে জীবনসংগ্রাম থেকে পালাতে চেয়েছেন। তাই এত বড় প্রতিভাধর (genius), এতবড় একজন তত্ত্বজ্ঞানী এবং তত্ত্বব্যাখ্যানী হয়েও আসলে তিনি হয়ে পড়েছিলেন পলায়নবাদী (escapist)। তাই সাহিত্যচর্চার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই — তাঁর নিজের ভাষায় বলতে গেলে — তিনি 'বাজে কথার ফুলের চাষ' করে গেছেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও দেশপ্রেম কারুর চেয়েই রবীন্দ্রনাথের কম ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদারনৈতিক। আমি জানি, বর্তমানে দেশের যা মানসিকতা তাতে আমার এই আলোচনা হয়তো অনেককেই আঘাত করে থাকবে। কিন্তু আমি নিরুপায়। যা আমি সত্য বলে বুঝেছি, তাকে নির্ভয়ে প্রকাশ করা আমার কর্তব্য। আপনাদের কাউকেই আঘাত করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয় — এ আলোচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথকে ছোট করাও নয়। তাঁকে ছোট করবার আমার সাধ্য কী, আর কেনই বা আমি তা চাইব। আমি এখানে এই আলোচনার দ্বারা আসলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল — এঁদের সাহিত্যচিন্তার মধ্যে মুখ্য শ্রেণীচরিত্র কী, তাই শুধুমাত্র নির্দেশ করতে চাইছি। কারণ কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে মুখ্য বা প্রধান শ্রেণীচিন্তা কী তা ঠিক ঠিক ধরতে না পারলে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনও সংস্কৃতি, কোনও সাহিত্য বা সাহিত্যচিন্তার ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও সঠিক মূল্যায়ন অসম্ভব। **আমি আগেই দেখিয়েছি, আমাদের দেশে নবজাগরণের যুগে, অর্থাৎ স্বাধীনতার সংগ্রাম ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে, ঐতিহাসিক কারণেই জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে মূলত হয়ে পড়েছিল উদারনৈতিক ও সংস্কারপন্থী-বিরুদ্ধবাদী। তাই পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগের বিপ্লবাত্মক ভাবাদর্শগুলির প্রকাশ ঘটেছে এদেশে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির চিন্তাধারায় আমরা জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর এই উদারনৈতিক, সংস্কারপন্থী ও আপসকামী দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্যই দেখতে পাই। আর এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রকাশ ঘটেছে শরৎ, নজরুল ও সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে।**

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজির ভাবধারায় যাঁরা আজও জীবনকে ঢেলে সাজাতে চাইছেন, তারা এঁদের মানবতাবাদী ভাবনাধারণাগুলি যে ভারতীয় পুঁজিবাদের পরিপূরক ভাবনাধারণা — তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে চাইছেন না। অর্থাৎ তাঁদের ভাবনাধারণা ও উপলব্ধির শ্রেণীগত দিকটা কী — বিচারের ক্ষেত্রে সেটাকে

এরা কোন মূল্যই দিতে চান না। কারণ, যেহেতু 'শ্রেণীসংগ্রাম', 'শ্রেণীচিন্তা', 'শ্রেণী ভাবনাধারণা' — এগুলি মার্কসবাদী তত্ত্ব, সেহেতু এদের মতে এগুলি মূল্যহীন। এঁরা মনে করেন, শ্রেণী-ফ্রেনী আসলে কিছুই নয় — ব্যক্তি ও ব্যক্তিচিন্তাই আসল। অথচ এঁরা জানেন না যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে — আমাদের সমাজও একটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজ — যে কোন ব্যক্তির চিন্তাই, আমরা চাই বা না চাই, আসলে কোনও না কোনও শ্রেণীর চিন্তা হতে বাধ্য। এ বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করলে একজন তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি যে শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করতে চান না — সেই শ্রেণীচিন্তারই বলি হয়ে পড়তে পারেন। গান্ধীজির মত মানুষের ক্ষেত্রেও এরূপ ব্যাপারই ঘটেছে বলে আমার ধারণা। তাই প্রায় সমস্ত মার্কসবাদীরা যখন একসুরে গান্ধীজিকে 'হিপোক্রিট' বলেছেন, আমি তাঁদের সাথে একমত হতে পারিনি। গান্ধীজি সম্বন্ধে এরূপ বিশ্লেষণের সঙ্গে আমার বিরোধ ছিল। গান্ধীজি সম্বন্ধে আমি সবসময়ই মনে করতাম এবং আজও মনে করি, তিনি একজন সৎ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তা না হলে বহু সৎ ও নিষ্ঠাবান লোক — যাঁরা কেউ বাজে লোক ছিলেন না, যাঁরা সর্বস্ব দিতে পারতেন — আমরা নিজের চোখে দেখেছি, তাঁরা সব দলে দলে গান্ধীজির শিষ্য হয়েছেন। হিপোক্রিট হলে এভাবে গোটা দেশকে তিনি তাঁর পেছনে জড়ো করতে সক্ষম হতেন না। গান্ধীজির ভূমিকার এমন অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সেদিনকার বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্বগত ও আদর্শগত নেতৃত্বের দেউলিয়াপনারই প্রমাণ। গান্ধীজির শ্রেণীচরিত্রের এমনতর সহজ ও সরল ব্যাখ্যার দরুনই সেদিন আমরা গান্ধীজির নেতৃত্ব ও ভাবাদর্শের প্রভাব থেকে দেশকে ও জনসাধারণকে রক্ষা করতে পারিনি। এইভাবে অযথা তাঁকে ছোট করতে গিয়ে জনসাধারণের সামনে আমরা নিজেদেরই ছোট করেছি। গান্ধীজির গায়ে এতটুকু আঁচড়ও কাটতে সক্ষম হইনি। গান্ধীজির মতাদর্শের সঙ্গে আমার বিরোধ এঁদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গান্ধীজির আদর্শে দেশের সর্বনাশ হয়েছে, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ সংহত হতে সুযোগ পেয়েছে — এসবই সত্য কথা। কিন্তু গান্ধীজি জেনেশুনে ইচ্ছা করেই পুঁজিপতিদের দালালি করেছেন, এরূপ বিশ্লেষণকে আমি অতি সরলীকৃত ও ভুল বলে মনে করি। আমি মনে করি, গান্ধীজি তাঁর মনগড়া ধারণা ও বিশ্বাস অনুযায়ী শ্রেণীসংগ্রামকে অস্বীকার করতে গিয়ে এবং সাধারণভাবে — অর্থাৎ শ্রেণী সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না করে — দেশ ও জনসাধারণের কল্যাণের কথা ভেবে, তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে তিনি আসলে যে শ্রেণীর চিন্তা ও স্বার্থ প্রতিফলিত করেছেন, তা হচ্ছে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী। পুঁজিপতিরা কিন্তু তাদের সহজাত শ্রেণীমানসিকতার দ্বারা সহজেই তা ধরতে পেরেছিল। তাই গান্ধীজিকে তারা পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, আশীর্বাদ করেছে, সর্বরকমের সাহায্য দিয়েছে। পুঁজিপতিরা ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে, তাঁকে দিয়ে তাদের ক্ষতি নেই, বরঞ্চ মঙ্গল আছে। অথচ এতবড় একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি হয়েও গান্ধীজি নিজে তার মননক্রিয়ার শ্রেণীগত দিকটি ধরতে পারলেন না। শ্রেণীসচেতন না হলে যেকোন প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটা অসম্ভব নয়। এবং গান্ধীজির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। যেমন আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবেন, আপনাদের ভাবনাধারণা ও আচরণগুলোর মধ্য দিয়ে আপনারা কোনও বিশেষ শ্রেণীর চিন্তা-ভাবনা ও স্বার্থকে প্রতিফলিত করেন না। কিন্তু গভীরভাবে বিচার করলে আপনারা দেখবেন, প্রত্যেক মানুষের প্রতি মুহূর্তের কাজ এবং ভাবনাধারণা — তা সে জেনেই হোক্ বা না জেনেই হোক্, কোন না কোন শ্রেণীকে সাহায্য করে। শ্রেণী সচেতন হলে আপনি তা জানতে পারেন, না হলে সমস্ত ব্যাপারটি আপনার অজ্ঞাতসারেই ঘটে। একটা উদাহরণ দিলেই আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে কিছুটা সহজ হবে। একজন মধ্যবিত্ত ঘরের পিতা যদি দেখেন যে, তাঁর ছেলে রাজনীতি নিয়ে মেতে উঠেছে তিনি তাঁর ছেলেকে সবসময়ই বলবেন, 'আগে নিজেরটা দেখ, সংসারের দায়িত্ব নাও। প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের নিজের সংসারের দায়িত্ব নেয়, সুখের সংসার গড়ে তোলে, তাহলেই দেশের মঙ্গল হবে; কারণ প্রতিটি পরিবার নিয়েই তো জাতি।' কোনও পিতা যদি আর একটু এগিয়ে চিন্তা করেন এবং খানিকটা দেশাত্মবোধ যদি তাঁর থাকে, তাহলে বড়জোর তিনি তাঁর নিজের ছেলেকে বলে থাকেন, 'দেশের কাজ করা তো ভালোই। কিন্তু আগে নিজের পায়ে দাঁড়াও, তারপরে দেশের কাজ কর। আপনি বাঁচলে বাপের নাম।' কিন্তু সেই ভদ্রলোকটির যদি কোন কারণে চাকরি যায় এবং চাকরিটি রাখার জন্য তাঁকে ইউনিয়নের কাছে ছুটতে হয়, তখন তিনি বুঝতে শেখেন যে, তাঁর একক শক্তিতে কাজ ফিরে পাওয়া অসম্ভব। তখন কিন্তু তাঁর মুখে ঠিক এর উল্টো কথাটিই আমরা শুনতে পাব। তিনি তাঁর প্রতি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে শুরু করবেন। কারণ, হার হোক্, জিত হোক্ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলে মিলে লড়াই করা ও প্রতিবাদ করা দরকার। তখন

তাঁর কথা হবে — 'সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।' এই যে পরস্পরবিরোধী দু'টি প্রবাদ আমাদের দেশে বহুদিন থেকে চলে আসছে, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' আর 'সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' — প্রয়োজনমতো এবং সময়মতো যাঁরা এগুলো বলেন, তাঁরা কি জানেন, তাঁদের এই কথা ও ঐভাবে আচরণের দ্বারা কোন্ শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে এবং কীভাবে তা হচ্ছে? বেশিরভাগই তা জানেন না এবং এতসব কথা সব মানুষ ভাবেনও না। নাহলে সহজেই দেখতে পেতেন, 'সবে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' — এই প্রবাদটি গড়ে উঠেছে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সমস্ত মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের স্বার্থের পরিপূরক হিসেবে — যে সংগ্রাম ব্যতিরেকে সমাজের বিকাশ অসম্ভব, অগ্রগতি অসম্ভব, অন্যায়ের প্রতিরোধ অসম্ভব। তাই এ হ'ল প্রগতির স্বার্থের কথা। প্রগতিশীল শ্রেণী, শোষিতশ্রেণী তার সংগ্রাম থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রবাদটা সৃষ্টি করেছে।

আর প্রতিক্রিয়াশীলরা, যারা কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ, যারা সমাজব্যবস্থাকে আর পাল্টাতে চায় না — তারা আপন শ্রেণীস্বার্থে চায় জনগণ যাতে বিচ্ছিন্নভাবে তাদের জীবনটাকে যাপন করে, কেউ যাতে না অপরের সাথে মিলতে পারে, প্রত্যেককে যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলা যায়। তার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলরা আর একটি ভাবনাকে, আর একটি মানসিকতাকে লালনপালন করেছে, তাহচ্ছে 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম — যে যার মতো আগে নিজেরটা দেখ, সব ব্যক্তিকে নিয়েই তো সমাজ।' তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই দু'টি প্রবাদ দু'টি পরস্পরবিরোধী শ্রেণী মানসিকতা ও স্বার্থকে প্রতিফলিত করছে। অথচ কয়জন মানুষ এসম্বন্ধে সচেতন? বেশিরভাগ মানুষই জানেন না যে, তাঁদের প্রতি মুহূর্তের আচরণ ও ভাবনাধারণাকে গড়ে দিচ্ছে সমাজের অভ্যন্তরে কোন না কোন একটি দার্শনিক চিন্তা। প্রত্যেক মানুষ যেভাবে কথা বলে, যে রুচিতে আচরণ করে — সমাজের অভ্যন্তরে যে দার্শনিক চিন্তাভাবনাগুলি রয়েছে, তা অভ্যাসের রূপে ও সংস্কারের রূপে সেই আচরণগুলিকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে। তাই মানুষ না জানলেও প্রত্যেকটি লোকের প্রতি মুহূর্তের ক্রিয়াকলাপ ও ভাবনাধারণা কোনও না কোনও দর্শনের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত। আর, দার্শনিক চিন্তামাত্রই শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনও না কোনও শ্রেণীর চিন্তা। তাই শ্রেণীগত চিন্তাকে বাদ দিয়ে আমরা চলতে পারি না। একথা একজন দার্শনিকের পক্ষেও সমান সত্য। তাই গান্ধীবাদ সম্বন্ধে তখন আমি বলেছিলাম, ''Gandhism is a sublimatic transformation of bourgeois class instinct, originated through the process of fusion between the senses of bourgeois moral values and the fear-complex of revolution of Gandhi''। অর্থাৎ, সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মটিকে অস্বীকার করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে সর্বমানবের কল্যাণ, অর্থাৎ উভয় শ্রেণীর একই সাথে কল্যাণ সাধন করতে চেয়েছিলেন বলেই একদিকে বুর্জোয়া নৈতিক মূল্যবোধগুলির আবেদন তাঁর মধ্যে জনতার প্রতি অশেষ মমত্ববোধ সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর বিপ্লবভীতিও একইসাথে তাঁর চিন্তাধারায় অজ্ঞাতসারেই কাজ করে চলেছিল। ফলে নিষ্ঠা ও সততার সাথে জনগণের কল্যাণের কথা চিন্তা করলেও যে মতাদর্শ, অর্থাৎ 'গান্ধীবাদ'-এর জন্ম তিনি দিলেন — তা বাস্তবে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থকেই রক্ষা করেছে ও আজও করে চলেছে।

গান্ধীজি মনে করতেন, শোষণ, অত্যাচার ও মানুষের সমাজের সমস্ত অকল্যাণের মূল কারণ হল লোভ, হীনমন্যতা, কাপুরুষতা এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার অভাব। তাই তিনি ভেবেছেন, 'উদারতা', 'সৎসাহস', 'মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের আদর্শ' ও 'নিঃশঙ্ক সত্যাগ্রহী' মনোভাবের দ্বারা সমাজের অভ্যন্তরের মানুষগুলোকে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেই এ সমস্যার সত্যিকারের সমাধান সম্ভব। এরূপ মনে করার কারণ, খ্রিস্টীয় ধারণার বিপরীতে গান্ধীজি গোড়াতেই ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষ আসলে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন (originally good), কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত এই শুভবুদ্ধিকে শয়তান আচ্ছন্ন করেছে। এবং তার ফলেই শোষণ, অত্যাচার, লোভ, হীনমন্যতা মানুষের সমাজে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই চিন্তা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক। মানবতাবাদী মূল্যবোধের সাথে ঈশ্বরতত্ত্বের সংমিশ্রণের ফলেই গান্ধীজির এরূপ বিভ্রান্তি ঘটেছে। এখানে ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রের ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলতে চাই। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, এমন ঈশ্বরতত্ত্ব প্রায় নেই বললেই চলে, যার সঙ্গে শয়তানতত্ত্ব মিশে নেই। কেন জানেন? কারণ, ঈশ্বর আছেন মনে করলেই সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে সবই তো ঈশ্বর করাচ্ছেন, 'সমস্ত চিন্তাই ঈশ্বরের চিন্তা — চিন্তা হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি' (Everything God contemplates – thinking is the contemplation of God)। এই যদি ধারণা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে যাবে, আমি যা করি, আপনি যা করেন, চোরেরা যা করে,

বিড়লা যা করে, যারা ছাঁটাই করে, রাহাজানি করে — তারা আবার নিজেরা কী করে? কারণ, সব তো ঈশ্বর তাদের দিয়ে করাচ্ছেন! সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করলে তার যুক্তিধারার পরিণতিতে এরূপ যে বিপত্তি হতে পারে — তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ঈশ্বরের 'এ্যান্টিথিসিস' (বিরোধী সত্তা) হিসাবে 'শয়তানের' অস্তিত্বের স্বীকৃতি দরকার পড়েছে। ঈশ্বর কখনও এসব খারাপ কাজ করতে পারেন? তাহলে এসব ঘটছে কী করে? না — এ সব শয়তানের কাজ। তাহলে আমরা দেখছি ঈশ্বরই একমাত্র সর্বশক্তিমান নয় — এগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য আবার ঈশ্বরের সমকক্ষ 'এ্যান্টিথিসিস' হিসাবে শয়তান এলো। কাজেই ঈশ্বর যেমন আছেন, শয়তানও তেমনি আছে। অথচ দেখা যাচ্ছে, ঈশ্বরের এমন ক্ষমতা নেই যে, তিনি তাঁর সন্তানদের শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন। শয়তানের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করার দায়িত্ব তাঁর সন্তানদের নিজেদের, আর সন্তানদের মোক্ষলাভের কৃতিত্বটি ঈশ্বরের। এতো এক আশ্চর্য কাণ্ড ! প্রায় অনুরূপ ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়ার ফলে গান্ধীজিও ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধিকে শয়তান আচ্ছন্ন করেছে। তাই যত বিপত্তি !

শোষণমূলক ব্যবস্থাই লোভের মানসিকতার জন্ম দিয়েছে

গান্ধীজি যদি একটা মনগড়া ধারণা থেকে ধরে না নিতেন যে, মানুষ ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি, মানুষের চিন্তা করবার যে ক্ষমতা বা তার মন — ঈশ্বর এর ভিতর দিয়েই চিন্তা করছেন — এ যদি তিনি ধরে না নিতেন, যদি নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ব্যক্তি-উপলব্ধির উপর অহেতুক জোর না দিতেন, যদি ইতিহাস ও বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে মানুষ আসার পরের থেকে ধীরে ধীরে মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশের ইতিহাস এবং তার মননশীলতার বিকাশ, মানুষের ভাবজগৎ ও নৈতিকতার বিকাশ, মানুষের অগ্রগতি ও অধঃপতনের ইতিহাস, সমাজবিকাশের ইতিহাস অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন, তাহলে তিনি সহজেই ধরতে পারতেন যে, লোভ, হীনমন্যতা ও শোষণের মনোবৃত্তি — মানুষের শুভবুদ্ধিকে শয়তান আচ্ছন্ন করেছে বলে সমাজে জন্ম নেয়নি। বুঝতে পারতেন, শোষণমূলকব্যবস্থাই অর্থাৎ সমাজে শোষণ করবার উপযুক্ত বাস্তব অবস্থা (material condition) উপস্থিত হওয়ার পরেই মানুষের মানসিকতায় 'শয়তানের', অর্থাৎ লোভ, নীচতা, শোষণের মনোবৃত্তির আবির্ভাব ঘটেছে। লোভের মানসিকতা শোষণমূলক সমাজের সৃষ্টি করেনি, শোষণমূলক ব্যবস্থাই লোভের মানসিকতার জন্ম দিয়ে চলেছে।

আদিম মানব সমাজের ইতিহাসের কয়েকটি পাতা ওল্টালেই আমার এ কথাটার প্রমাণ মিলবে। মানুষ যখন আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে বাস করত, তখনকার গোষ্ঠীগুলোর (clan) ইতিহাস যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আমরা কী দেখতে পাই? ঐ সময়ে মানুষগুলো কি আজকের মতো সভ্য মানুষ ছিল? না, তারা মানবতাবাদী ছিল? তখন তারা রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বেরও কোন খবর রাখত না, গান্ধীজির অহিংসা ও সত্যাগ্রহ তত্ত্বেরও কোন ধার ধারত না। তখন তাদের মানসিকতা প্রায় জানোয়ারের স্তরে ছিল। জানোয়ারের সঙ্গে শুধু এইটুকু মাত্র তফাৎ ছিল যে, অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারদের কার্যকলাপ যেখানে সর্বদাই 'রিফ্লেক্স অ্যাকশন্', অর্থাৎ 'কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স' ও 'আন-কন্ডিশনড রিফ্লেক্স' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তা পুরোপুরি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, সেখানে মানুষের মস্তিষ্কের উন্নততর গঠনের জন্যই মানুষের ভিতরে 'পাওয়ার অব ট্রানশ্লেসন্' বর্তমান। এরই ফলে 'সেন্সেশন টু মোটর অ্যাকশন্' থেকে 'প্রসেস অব ট্রানশ্লেসন'-এর মারফত প্রথমে 'পার্সেপচুয়াল নলেজ' এবং তার থেকে 'কন্সেপচুয়াল নলেজ' গড়ে তোলার একটা পদ্ধতি মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কাজ করছে। মস্তিষ্কের গঠনগত এই পার্থক্য বাদ দিলে তখনকার গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষগুলোর মানসিকতা ও আচরণ প্রায় জানোয়ারের স্তরে ছিল। এক টুকরো খাবার নিয়ে মানুষগুলো তখন অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের মতই কাড়াকাড়ি ও কামড়াকামড়ি করত, যেমন রাস্তার কুকুর কাড়াকাড়ি করে খায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোষ্ঠীগুলো ভেঙে যায়নি এবং তখনও সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়নি। প্রায় জানোয়ারের স্তরের মানসিকতা ও আচরণ এবং পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকলেও গোষ্ঠীর মানুষগুলোর মধ্যে শোষণ করবার মনোবৃত্তি দেখা দেয়নি, অপরের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে লাভ করবার বা মুনাফা অর্জন করবার মনোবৃত্তিরও তখন জন্ম হয়নি। এবং ততদিন পর্যন্ত এসব মনোবৃত্তি সমাজের মানুষের মধ্যে দেখা দেয়নি যতদিন পর্যন্ত না সমাজে স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ যে সম্পত্তির সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদনের উপায়টি এমন হয়েছে যাতে মানুষের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনকে ক্রমাগত বাড়ানো যায় ও তার থেকে লাভ

করা যায়। পশুপালন ও চাষবাসের আবিষ্কারই উৎপাদনের উপায়টি পাল্টে দিল এবং স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টি করল। অর্থাৎ উৎপাদনের শৈশব অবস্থায় একদিকে উৎপাদনের স্বল্পতা এবং অপরদিকে মানুষের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন — এই দু'য়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছিল, তারই ফলে এই নূতন পরিস্থিতিতে স্থায়ী সম্পত্তির সৃষ্টি এবং চাষবাস ও পশুপালনে মানুষের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সম্পত্তি বৃদ্ধির উপায়টি আবিষ্কৃত হবার ফলেই মানুষের চিন্তায় একটা জিনিষ ধাক্কা দিল। গোষ্ঠীপতিরা, অর্থাৎ গোষ্ঠীর যারা সর্দার তারা দেখল যে, গোষ্ঠীসম্পত্তি যদি সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়, তাহলে তাদের প্রয়োজন ভালভাবে মিটছে না। তাই তারা যদি সমস্ত গোষ্ঠীসম্পত্তির জবরদস্তি মালিক হয়ে বসতে পারে, আর বাকি মানুষগুলোকে দাসে পরিণত করতে পারে, তাহলে তাদের পরিশ্রম কাজে লাগিয়ে তার সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারে এবং আরামে থাকতে পারে। এই গোষ্ঠীপতিরা এবং গোষ্ঠীর মধ্যে শক্তিমানেরা জবরদস্তি অপর মানুষগুলোকে লাঠির জোরে পদানত করল ও দাসে পরিণত করল এবং সমস্ত গোষ্ঠীসম্পত্তিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত করল। এইভাবেই গোষ্ঠীর সকল মানুষগুলোর সম্মিলিত পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট সম্মিলিত গোষ্ঠীসম্পত্তি ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল। শুধু যে গোষ্ঠীসম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল তাই নয় — ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টি হওয়াতে স্ত্রী-শাসিত সমাজ ভেঙে পড়ল ও এই প্রথম পুরুষ-শাসিত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল — যার জের এখনো কাটেনি। যদিও এ ব্যাপারটা একদিনে হঠাৎ ঘটেনি। উৎপাদন পদ্ধতি পাল্টানোর ফলে, অর্থাৎ চাষবাসের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে শ্রমের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য এসে গেল এবং মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয় বলে এই নূতন পরিস্থিতিতে শ্রমের ক্ষেত্রে তারা যে পিছিয়ে পড়ল — পুরুষরা তার সুযোগে স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং নিজেদের আধিপত্য মেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিল। স্ত্রী-পুরুষের আধিপত্য নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সংঘর্ষের অত্যন্ত করুণ কাহিনী ইতিহাসে লুকিয়ে আছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মেয়েরা পুরুষদের দ্বারা সম্পূর্ণ দমিত হয়ে গেলেও তারা কিন্তু এ অবস্থাকে অত সহজে মেনে নিতে চায়নি। তাই এই আধিপত্য মেয়েদের মানাবার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পুরুষশাসিত সমাজের স্বার্থের অনুকূলে নীতি, আদর্শ অনেক কিছুই আসতে থাকল এবং ধীরে ধীরে পুরুষ-শাসিত সমাজের নিয়ম-নীতি, আদর্শ প্রভৃতিতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল এবং এইভাবেই কালক্রমে মেয়েরাও পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল। তারপর একদিন অবস্থা এমন দাঁড়িয়ে গেল যে, আমরা দেখতে পাই, মেয়েরা নিজেরাই নারী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছে। তাহলে এই ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের স্বল্পতাজনিত অভাববোধ মানুষের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও শোষণ করবার বা মুনাফা অর্জন করবার মনোবৃত্তি ততদিন পর্যন্ত জন্ম নেয়নি, যতদিন না সম্পত্তি স্থায়ী সম্পত্তির রূপ নিয়েছে এবং মানুষের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও লাভ করবার প্রক্রিয়াটি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই 'ক্ল্যান কমিউনিস্ট সোসাইটি'র জংলি মানুষগুলো হাজার অভাববোধ থাকা সত্ত্বেও যেখানে জানত না কী করে শোষণ করা যায়, সেখানে আজকের সভ্য মানুষ মানবতাবাদী, গান্ধীবাদী হয়েও এই শোষণের মনোবৃত্তি, লোভ ও হীনমন্যতা থেকে — নিজেদের সদিচ্ছা ও আদর্শবাদ থাকা সত্ত্বেও — কিছুতে নিজেদের মুক্ত করতে পারছেন না। এর কারণ কী? পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উৎপাদনের চরিত্র, উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কই আজকের সমাজের সর্বপ্রকার জুলুম, অত্যাচার ও সামাজিক অবিচারের মূল কারণ এবং এই ব্যবস্থাই সমাজে মানুষের মধ্যে এইসব মনোবৃত্তিগুলি এবং মনোভাবনাগুলির প্রতিনিয়ত জন্ম দিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায়, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় অনেক সাধ্যসাধনার পথে কিছু লোক সাময়িকভাবে হলেও এইসব মনোবৃত্তিগুলির হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করতে সক্ষম হল, তাহলেও দেখা যাবে যে, ঐ লোকগুলিকে সংশোধিত করতে করতে ইতিমধ্যেই সমাজ অভ্যন্তরে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবেই লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে আবার ঐ সব মনোভাবনাগুলির নতুন করে সৃষ্টি হয়ে বসে আছে। ফলে, এ এক ধরনের 'ফেটিসিজম্'। তাই গান্ধীজি নির্দেশিত পদ্ধতিতে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব তো নয়ই — উপরন্তু এই পদ্ধতিই বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পরোক্ষে ও সূক্ষ্মভাবে সাহায্য করছে — অতীতেও করেছে, বর্তমানেও করছে। পরোক্ষে ও সূক্ষ্মভাবে করছে বলেই আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা আরও মারাত্মক। কারণ, পুরোপুরি শ্রেণীসচেতন না হলে জনসাধারণ এর সঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে না।

মানুষের কোন মনোবৃত্তি এবং ভাবনাধারণাই যে শাশ্বত ও চিরন্তন নয় এবং যেকোন ভাবনাধারণা ও

প্রবৃত্তি গড়ে ওঠবার বাস্তব পরিবেশটি যে আগেই সমাজে উপস্থিত হয়, তারপর এগুলি গড়ে ওঠে — এ সত্য বুঝতে অক্ষম হওয়ার ফলেই গান্ধীজি সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়ম, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রগতি ও বিকাশের নিয়মকে অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। তাই পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের স্বাভাবিক পরিণতি যে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উচ্ছেদ ও শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা — এ সত্যকেও উপলব্ধি করতে গান্ধীজি সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষের মনোবৃত্তি ও মনোভাবনাগুলি সমাজব্যবস্থা, উৎপাদনপদ্ধতি এবং জীবনধারা পাল্টাবার সাথে সাথে পাল্টায় এবং নতুন সমাজব্যবস্থায় নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন উৎপাদন সম্পর্ককে ভিত্তি করে মানুষের নতুন মনোবৃত্তি ও মনোভাবনাগুলির জন্ম হয়ে থাকে। এইভাবে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হওয়ার পর থেকে শ্রেণীসংগ্রামের অগ্রগতি ও বিকাশের পথেই সমাজব্যবস্থা তার রূপ পাল্টাতে পাল্টাতে আজকের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাতে শ্রেণীসংগ্রাম আজ চরম ও চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। তাই আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে তীব্র মতবিরোধ ক্রমেই প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে, তা আমাদের সমাজের বুর্জোয়া ও সর্বহারার তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের প্রতিফলন মাত্র।

আমি আগেই আলোচনায় দেখিয়েছি, গান্ধীজি শ্রেণীসচেতন না হওয়ার ফলে তাঁর চিন্তাধারায় তাঁর অজ্ঞাতসারেই ভারতীয় জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবনা-ধারণাগুলি প্রধানত কাজ করেছে। ফলে, ধর্ম ও ভারতীয় ঐতিহ্যবাদের সাথে বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভাবনাধারণাগুলিকে মিলিয়ে তিনি যে মতবাদ দাঁড় করালেন এবং যে সংগ্রামপদ্ধতি অনুসরণ করে চললেন, তাতে দেশের এবং জনসাধারণের কল্যাণসাধন করবার শত ইচ্ছা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত তিনি কিন্তু পুঁজিপতিশ্রেণীরই স্বার্থকে সংহত হতে সাহায্য করলেন এবং সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং অজ্ঞাতসারেই ঘটলো। তাই তাঁর অবস্থা হয়ে পড়েছিল অনেকটা যেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন স্নেহময়ী মাতার মত — যাঁর ধারণা তাঁর অসুস্থ ছেলেকে যদি বিদেশি ম্লেচ্ছদের ওষুধ খাওয়ানো হয়, তাহলে সে মরে যাবে। ছেলেকে বাঁচাতে হলে তাকে কঠোর উপবাস, আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠার দ্বারা গৃহদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। কারণ তার ধারণা গৃহদেবতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, আত্মা কলুষিত হয়েছে — তাকে শুদ্ধ করতে হবে, কঠোর আত্মত্যাগ ও উপবাসের দ্বারা নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করতে হবে। এই উপমাটির দ্বারা আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাইছি যে, গান্ধীজি নিজে যাই ভেবে থাকুন না কেন, তাঁর রাস্তাটা ভুল। তাঁর রাস্তাটা শেষপর্যন্ত যে বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থকেই প্রতিষ্ঠিত করবে, এটা তিনি দেখতে পাননি। রমাঁ রলাঁ একবার গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "ধরুন, এই যে আপনি মনে করছেন, আপনি আপনার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের দ্বারা মালিকদের বুঝিয়ে আপনার পথে আনতে সক্ষম হবেন, সত্যাগ্রহীরা তাদের আদর্শ দিয়ে, জীবন দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবেন, কারণ মালিকরাও মানুষ — আপনার এই প্রচেষ্টা যদি ইতিহাসের ধোপে না টেকে এবং তারা যদি আপনার পথে না আসে, তখন কী করবেন?" যতদূর আমার মনে পড়ে এবং যদি ভুল করে না থাকি, গান্ধীজি বলেছিলেন, "যদি তারা না আসে এবং আমার এই পরীক্ষা ব্যর্থ হয়, আমি তখন জনসাধারণের পক্ষেই থাকব এবং রক্তাক্ত বিপ্লবের পথই গ্রহণ করব।" কিন্তু, এই 'যদি তারা না আসে' ব্যাপারটার গান্ধীজি সারা জীবন ধরে তাঁর তত্ত্ব ও সংগ্রামপদ্ধতি প্রয়োগ করেও মীমাংসা করতে পারলেন না এবং তাঁর এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হল তাও শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করে যেতে পারলেন না। এবং জনতার পাশে দাঁড়িয়ে বিপ্লবী আন্দোলনে সামিল হওয়াও তাঁর জীবনে আর হয়ে উঠল না। কারণ, এ পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। আমি আগেই বলেছি, এ এক ধরনের 'ফেটিসিজ্‌ম'। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, আত্মত্যাগ ও সত্যাগ্রহী মনোভাবের দ্বারা সমাজের মানুষগুলোর নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করতে হবে এবং অসীম সাহসের সাথে অহিংস সংগ্রামের পথেই সর্বপ্রকার অন্যায়ের মোকাবিলা করতে হবে — এসব তত্ত্ব বুর্জোয়া স্বার্থেরই পরিপূরক। এ তত্ত্বের দ্বারা গান্ধীজি নিজেকেও ঠকিয়েছেন এবং দেশ ও জনসাধারণকে ঠকিয়েছেন। নৈতিক চরিত্রকে উন্নত করতে হবে — এ ব্যাপারে গান্ধীজির সাথে আমাদের বিরোধ নেই। বিরোধ আসলে দেখা দিচ্ছে নৈতিকতার প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে। কী সেই নৈতিকতার ধারণা যা আজকের এই চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামের যুগে সমাজপ্রগতির পরিপূরক, শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত মানুষের মুক্তিসংগ্রামের সহায়ক? বিরোধ দেখা দিচ্ছে আসলে এইখানে। গান্ধীজি যেখানে মানুষের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রশ্নটিকে শ্রেণীনিরপেক্ষ ও শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটা মূল্যবোধ বা নৈতিকতা বলে মনে করতেন, আমরা সেখানে নৈতিক ধ্যানধারণাগুলিকেও শ্রেণী ভাবনাধারণা বলে মনে

করি। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলে রাখতে চাই। যেসব 'বিপ্লবীরা' বড় বড় বিপ্লবী বুলির আড়ালে নৈতিকতার প্রশ্নটিকেই একদম উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন বা ছোট করে দেখেছেন, তাঁরা নিজেদেরও অধঃপতিত করেছেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনেরও কোমর ভেঙে দিয়েছেন। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে নৈতিকতার প্রশ্নে এরূপ বিভ্রান্তি আমি আজও লক্ষ্য করছি এবং এধরনের 'বিপ্লবী'দের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

নৈতিকতার সংকটই দেশের সাংস্কৃতিক ও বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে প্রধান বাধা

তাই আপনাদের সামনে — যাঁরা আজ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিযুক্ত রয়েছেন, যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন, যাঁরা বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মূল্যাবোধের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের সামনে যে সমস্যাটা আজ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে, দেশজোড়া নৈতিকতার সঙ্কট। ঘর ভাঙছে, পরিবার ভাঙছে, ছেলেকে মানুষ করতে চাইছেন — ওটা রাজকাপুরের চেলা হয়ে বসে রইল, নয়তো দেখা যাচ্ছে পাড়ার এক 'গুরু' ধরে বসে আছে। আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুনছি, তাহচ্ছে, 'গুরু'। সব পাড়ায় পাড়ায় 'গুরু'র আবির্ভাব ঘটছে। আপনার ছেলে, আপনি তার কথা ভেবেই সংসার করলেন, রাজনীতি করলেন না, কারণ আপনি মনে করেন, রাজনীতি করে কিছু হবে না। আপনি কত কল্পনা ও স্বপ্ন নিয়ে ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে গেলেন। কিন্তু দেখলেন, ছেলেটা হয়ে পড়েছে একরকম, মেয়েটা আরেকরকম, একটা রাজকাপুরের চেলা তো আরেকটা অন্য কোন সিনেমা আর্টিস্টের 'ফ্যান' — যে যার মতন। এরকম হচ্ছে কেন? ভালবাসায় পর্যন্ত আজ আর সুখ নেই। কত কল্পনা নিয়ে একজনকে হয়তো ভালবেসেছেন, কিন্তু ক্রমেই তা যেন শুকিয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা কিছুর অভাব, কী যেন নেই। এসব কথা আমি বলছি, কারণ আমি আমাদের সমাজটা জানবার চেষ্টা করেছি, এর মানুষগুলোকে বোঝবার চেষ্টা করেছি। অনেকের মুখের দিকে চাইলে মনে হয়, কী যেন একটা চাপা ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছে। এই যে এত 'সিজোফ্রেনিয়ার' প্রাবল্য, এত মানসিক অসুস্থতা মানুষের মধ্যে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ কী? আর্থিক প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষ যেন একটা চাপা ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছে — কী যেন নেই। তাই মানুষ যেকোন উপায়ে পয়সা রোজগারের নেশার মধ্যে, আরাম বিলাসের মধ্যে, নাইট ক্লাবে মদ খেয়ে নার্ভকে কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজিত করে — নানাভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছে। গোটা দেশের মানসিকতায় এক অস্থিরচিত্ততার লক্ষণ। কোথাও শান্তি নেই। এ কি সুস্থতা? আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন, পয়সা হলে আপনাদের অভাব যাবে, শান্তি ফিরে আসবে। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবেন, হাজার পয়সা রোজগার করেও অনেক পরিবারেই শান্তি নেই। নাহলে পয়সাওয়ালারা রাতভর নাইট ক্লাবে নাচানাচি করে, মদ খেয়ে, অহেতুক নিজেদের নার্ভকে উত্তেজিত করছেন কেন? আসলে ঘরে শান্তি নেই। তারা তাই ভাবেন, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে কী করব! ঘরে গিয়ে দেখব, স্ত্রী হয়তো অন্য কারুর সঙ্গে অন্য কোনও নাইট ক্লাবে স্ফুর্তি করতে গিয়েছে। উপরতলার লোকদের অনেকেরই এই অবস্থা — যে উপরতলায় উঠবার জন্য আপনাদের অনেকেরই অন্যসব কিছু ভুলে দিনরাত কী আপ্রাণ চেষ্টা! একটু লক্ষ করলেই আপনাদের চোখে পড়বে, 'ইনটেলেকচুয়ালদের', শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আজকাল ক্রমেই যেন সমাজ সম্পর্কে একটা বীতস্পৃহা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষগুলো ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসর্বস্ব ও হামবড়া হয়ে পড়ছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর শাশ্বত ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধ ও বিশুদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমাগত জন্ম দিয়ে চলেছে জীবনবিমুখ, সংগ্রামবিমুখ, পলায়নী ও কল্পনাবিলাসী মানসিকতার। এরূপ মানসিকতাই তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম ও আজকের সমস্যাসঙ্কুল জীবনের জটিল সংগ্রামের মধ্যে পড়ে আজ 'সিজোফ্রেনিক পারসোনালিটি'র জন্ম দিচ্ছে। এইরকম কাল্পনিক ভাবনাধারণা, অর্থাৎ 'ফ্যান্টাসি'র জগতেই আজকাল অনেক যুবক-যুবতী বাস করছে। ডাক্তারদের যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বলবেন যে, মানুষের নৈতিকতার মানকে আমরা এমন সুন্দর এবং উন্নত জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি যে, এত 'প্রগতির' আন্দোলন সত্ত্বেও আজকাল যুবক-যুবতীদের মধ্যে অস্বাভাবিক আচরণ (abnormality) ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। 'সিজোফ্রেনিক' রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে; 'স্প্লিট পারসোনালিটি'-র সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ আজ যেন বাস্তব থেকে মুখ ফিরিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সত্যিকারের সুখের জিনিস বলে যা একজন ভাবে, বাস্তবে তা সে দেখতে পায় না। তাই সুখ ও আনন্দের চিন্তা তার হয়ে পড়েছে স্বপ্নের ও কল্পনার বিষয়। আর বাস্তবে জীবনটা হয়ে দাঁড়িয়েছে আনন্দবর্জিত ও রসহীন। এমন হচ্ছে কেন? কারণ, **পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধের আবেদন অনেক আগেই এদের মধ্যে নিঃশেষিত**

হয়ে গিয়েছে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধও আজ এদের মধ্যে প্রায় নিঃশেষিত। অথচ, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী মতাদর্শ ও নতুন মূল্যবোধ দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে ও সমাজজীবনে আজও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে না পারার ফলে আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলেই দেশের নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই সর্বাত্মক সংকট।

স্বাধীনতা আন্দোলনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ অবহেলিত হয়েছে

নৈতিকতার এই সর্বাত্মক সংকট সমাজের একদম নিচের তলায়, অর্থাৎ মজুরশ্রেণী, খেতমজুর, গরিব চাষী, ভাগচাষী, যাদের অভাব ও দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে কিন্তু আজও এত তীব্র আকার ধারণ করেনি। কারণ, আজও এদের মধ্যে পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবতাবাদী মূল্যবোধ পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, আজও তা এদের মধ্যে খানিকটা কাজ করে চলেছে। কিন্তু অবিলম্বে সর্বহারাশ্রেণীর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিস্তৃতিসাধন ও তীব্রতা বৃদ্ধির দ্বারা যদি শ্রমিক-চাষীর বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক নতুন মূল্যবোধ ও নৈতিকতার একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করা না যায়, তবে এদের জীবনেও নৈতিকতার সংকট ব্যাপক আকারে দেখা দেবে এবং শ্রমিক-চাষীর বিপ্লবী সংগ্রামগুলিকেও তা ভেতর থেকে পঙ্গু করে দেবে। কারণ, একদিকে শ্রেণীশোষণের ক্রমশ তীব্রতা বৃদ্ধি আর একদিকে দেশজোড়া আদর্শ ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে এই যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে ইতিমধ্যেই এদের পুরনো নৈতিক চরিত্রে ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়, অর্থাৎ জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগে যে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবধারা এদেশে এল, তার মধ্যে দুটো ধারার কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটি ধারা যা ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সাথে মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। ফলে, এ ছিল পঙ্গু, পলায়নী, জরাগ্রস্ত মানবতাবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এ ছিল উদারনৈতিক, আপসমুখী, সংস্কারপন্থী ও বিরুদ্ধবাদী। এইটিই ছিল গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এদেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রধান ধারা এবং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যথাক্রমে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথ। এই ধারার পাশাপাশি এদেশে আরেকটি ধারা ছিল, যা পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগের যৌবনোদ্দীপ্ত ও বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদী ভাবধারা — যার প্রকাশ ঘটেছিল, আমি আগেই বলেছি, এদেশে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এবং যা ছিল মূলত দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) ও ধর্মনিরপেক্ষ এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্র ও ধর্মের বিরুদ্ধে আপসহীন। রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এই ধারার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যথাক্রমে তখনকার বিপ্লবীরা এবং শরৎচন্দ্র ও নজরুল। তখনকার দিনে গান্ধীজির সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা এবং শরৎচন্দ্রের সাথে সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবীদের সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতার খবর যাঁরা রাখেন, তাঁদের কাছে এ সত্য পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। **গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে জরাগ্রস্ত আপসমুখী মানবতাবাদী ভাবধারার প্রাধান্যের জন্যই রাজনৈতিক বিপ্লবের কর্মসূচির মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচিকে আমরা যুক্ত করতে পারিনি। এটাই ছিল গোটা আন্দোলনের দুর্বলতার প্রধান দিক। রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে এর বিশেষ বিরোধিতা করা সম্ভব না হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র ও নজরুল, অবহেলায় পরিত্যক্ত ও ভূলুণ্ঠিত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ঝান্ডাটিকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। নেতৃত্ব জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে থাকার ফলে এ প্রচেষ্টা শেষপর্যন্ত পুরোপুরি সফল না হলেও স্বাধীনতা আন্দোলনের হাজার ত্রুটিবিচ্যুতি ও দুর্বলতার মধ্যে মানবতাবাদী ভাবাদর্শের এইটিই ছিল বলিষ্ঠতার দিক।** এই দুর্বলতা ও বলিষ্ঠতা — এই দু'টি দিক নিয়েই এদেশের মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে যে নতুন নৈতিকতার মান গড়ে উঠেছিল, সেটাই সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সর্বপ্রকার গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কারণ, বুর্জোয়া মানবতাবাদ সেদিন ছিল দেশের স্বাধীনতা ও সমাজপ্রগতির পরিপূরক। জাতীয় স্বাধীনতা লাভের পর বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম ও পুঁজিবাদ সংহত হবার সাথে সাথে সেদিনকার প্রগতিশীল বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যাবোধগুলি আজ শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে 'প্রিভিলেজ্'-এ বা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা তার প্রগতির চরিত্র হারিয়ে আজ শ্রমিক ও শোষিত জনসাধারণের আন্দোলনকে দমন করা ও শোষিতশ্রেণীর চেতনাকে বিপথগামী করার কাজে শোষক

বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এইভাবেই ইতিহাসে একদিন যে মতবাদ সমাজপ্রগতির প্রয়োজনে শোষিতশ্রেণীর সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবে গড়ে ওঠে, তাই আরেকদিন উৎপাদনের বিকাশের আরেকটা ভিন্নতর বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের পরিবর্তিত অবস্থায় শোষিতশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের নতুন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে, তার পূর্বেকার প্রগতির চরিত্র হারিয়ে শোষকশ্রেণীর হাতে সুবিধায় পর্যবসিত হয়। উৎপাদনের বিকাশের যে বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে, অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের যে বিশেষ স্তরে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল দেশের শোষিত জনসাধারণের মূল রাজনৈতিক সংগ্রাম, সেই সময়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের মতাদর্শগত ক্ষেত্রে যে লড়াই চলছিল, তা ছিল মূলত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জনগণের উপর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সাথে শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের নেতৃত্ব (hegemony) প্রতিষ্ঠার লড়াই চলতে থাকলেও, একথা মনে রাখা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলি কিন্তু তখনও তার প্রগতিশীল চরিত্র সম্পূর্ণ খুইয়ে বসেনি। কিন্তু, আজ উৎপাদনের বিকাশের আর একটি ভিন্নতর পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ যে বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বই সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলির মধ্যে মূল বা প্রধান দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা দিয়েছে, এবং যেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের স্বার্থ গোটা সমাজের প্রগতির স্বার্থের সাথে ঐতিহাসিক নিয়মেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেখানে বুর্জোয়া মানবতাবাদ, তার মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণা, শুধু যে তার পূর্বেকার প্রগতির চরিত্রই হারিয়ে বসে আছে তাই নয়, শ্রমিক-চাষীর মুক্তিসংগ্রামের মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আজ তা প্রধান বাধাস্বরূপ। কাজেই রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল একদা মূল্যবোধ ও নৈতিকতার মানটিকে যে উচ্চতর পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে গিয়েছেন, আজকে এই পরিবর্তিত অবস্থায় সেই মূল্যবোধগুলিকেই যদি আঁকড়ে ধরে থাকবার চেষ্টা করেন, আমি আগেই বলেছি, তা আপনাদের ক্রমাগত নীচের দিকে টেনে নামাতে থাকবে। উৎপাদনের বিকাশের এই ঐতিহাসিক বিশেষ স্তরে শ্রেণীসংগ্রামের যে জটিলতার মধ্যে আমরা সবাই পড়েছি, সেখানে একদিকে ছাঁটাইয়ের সমস্যা, অপরদিকে একই সাথে কলকারখানাগুলিকে খাড়া রাখবার সমস্যা; একদিকে বেকারদের চাকরি দেওয়ার সমস্যা, মজুরদের চাকরীর স্থায়িত্বের সমস্যা, অপরদিকে কিছুদিন অন্তর অন্তর মন্দার সমস্যা। ফলে, শিল্পবিপ্লবের ধারাকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, যে কলকারখানাগুলো ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে সেগুলিকেই টিকিয়ে রাখার সমস্যার মধ্যে আমরা পড়েছি। একদিকে কৃষির আধুনিকীকরণের প্রয়োজন, অপরদিকে এই ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণ করতে গেলে এক ধাক্কায় যে লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ বেকারের সৃষ্টি হবে, তাদের কর্মসংস্থানের সমস্যা। এই সমস্যাগুলো পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতার সর্বাত্মক সংকটের চরিত্রকেই ক্রমশ প্রকট করে তুলছে। তাই আজকের সমাজপ্রগতির সমস্যা হচ্ছে, পুঁজিবাদী শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনসাধারণের মুক্তির সমস্যা, অর্থাৎ উৎপাদনকে, উৎপাদিকা শক্তিকে পুঁজিবাদী শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সমস্যা ও তার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান, 'টেকনোলজি', শিল্প-সাহিত্য এক কথায় মানুষের গোটা সংস্কৃতিকে পুঁজিবাদী শৃঙ্খল ও মুনাফা লুটবার উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত করার সমস্যা।

তাই আজকে প্রগতির জন্য মূল সংগ্রাম হচ্ছে, সমাজের বস্তুগত উৎপাদন ও ভাবগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া আধিপত্যের জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ও বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারা গণতন্ত্র ও সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এরূপ একটি জটিল ও সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধগুলিকে আজও আঁকড়ে ধরে থাকবার মনোবৃত্তির ফলেই নৈতিক চরিত্রকে কীভাবে ঠিক রাখা যায়, কোন্‌টা করলে উচিত হবে — এসবই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ফলে, আমরা বাস্তবের আঘাতে যেটা করি, তা হচ্ছে, শেষপর্যন্ত দেশের শিল্পকে রক্ষা করার নামে কথার চাতুরিতে মালিকের স্বার্থের পায়েই মজুরের স্বার্থকে বলি দিই। আর নিজেদের এই বলে প্রবোধ দিই যে, বড় কাজের জন্য অনেক ছোট ক্ষতি স্বীকার করতেই হয় ! তাই আজকের দিনে সমস্ত মানবতাবাদীরাই, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে যত সৎ-ই হ'ন না কেন, যাঁরা নিজেদের এখনও মানবতাবাদী ভাবধারা থেকে সর্বহারা বিপ্লবী ভাবধারায় উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হননি, অর্থাৎ মানবতাবাদী চিন্তা থেকে কমিউনিস্ট চিন্তায় উত্তরণ যাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, তাঁরা আজকের এই নিঃশেষিত মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলিকে নিয়ে চলতে চেষ্টা

করবার ফলেই 'প্র্যাকটিক্যাল কনসিডারেশন'-এর নামে 'প্র্যাগ্‌ম্যাটিক ইন্‌ এ্যাপ্রোচ' হয়ে পড়ছেন, অর্থাৎ বাস্তববাদী হওয়ার নামে প্রয়োজনবাদী হয়ে পড়ছেন এবং ধীরে ধীরে এইভাবেই এইসব সুবিধাবাদী (pragmatic) আচরণগুলোর সপক্ষে যুক্তি খাড়া করতে করতে নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নৈতিকতার ক্ষেত্রে নিজেদেরকেও নিচে নামাচ্ছেন এবং একইসাথে নানা রকমের রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্ম দিয়ে চলেছেন। একজন সৎ ব্যক্তির কী মর্মান্তিক পরিণতি! তাই আজকের দিনে যত নামকরা মানবতাবাদীরা রয়েছেন, তাঁদের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, — এইসব মানবতাবাদীরা, রবীন্দ্র-উপাসকরা শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে কত সহজেই না নিজেদের গা বাঁচিয়ে নিশ্চিত আরামে বিশুদ্ধ সংস্কৃতি ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতত্ত্বের চর্চায় বুঁদ হয়ে আছেন। এঁরাই নাকি আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের উত্তরসাধক! এঁরা ঘটা করে ঢাকঢোল পিটিয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করেন। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের পাশে তাঁদের আমরা পাই না। অথচ, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।" এঁদের আজকের আচরণে কোথাও এর প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যায় কি? আজ শোষণ অত্যাচার এবং প্রতিনিয়ত সমাজ অভ্যন্তরে যে মানবাত্মার অবমাননা হয়ে চলেছে, তার জন্যে এইসব লোকের মধ্যে কোথায় সেই যন্ত্রণা, কোথায় সেই জ্বালা যা তাঁদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে? এঁরা জনগণের কোন সংগ্রামের সৈনিক নন, অথচ এঁরাই হচ্ছেন আজকের দিনের রবীন্দ্রভাষ্যকার! রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের মূল্যবোধগুলি এঁদের কাছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার নয়, বরং এঁদের কাছে এগুলো হয়ে পড়েছে নিছক 'প্রিভিলেজ' (সুবিধা) — নামকরা লোক সাজবার একটা 'ইনটেলেক্‌চুয়াল' সুবিধা মাত্র !

আজকের মানবতাবাদীদের মধ্যে দুই বিপরীত মেরুর প্রতিক্রিয়া

আপনারা যাঁরা সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তাধারা ও ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে তাঁদের আজ নিরলসভাবে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। বিশ্বপুঁজিবাদের চূড়ান্ত সর্বাত্মক সংকটের মধ্যে পড়ে মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধগুলির কত প্রকার বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটেছে এবং আজ তার কী করুণ পরিণতি হয়েছে জনমানসের সামনে তার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে হবে।

বুর্জোয়া মানবতাবাদের পুরনো মূল্যবোধগুলি আজ আর কাজ করছে না বলে মানবতাবাদী ভাবজগতে দু'টো সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর এই চূড়ান্ত শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে পড়ে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মননশীলতার যে দু'টো চূড়ান্ত বিপরীত মেরুতে অবস্থানের পরিণতি ঘটেছে, তারই একটির থেকে ফ্যাসিবাদ ও অপরটি থেকে সার্ত্রের 'এক্‌জিস্‌টেনসিয়ালিজম্‌-এর (অস্তিত্ববাদের) জন্ম, যদিও একথা শুনতে আপনাদের অবাক লাগতে পারে। কিন্তু, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থানের পিছনকার ইতিহাস, অর্থাৎ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত দিক — ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিচার করে দেখলে এ সত্য সহজেই পরিস্ফুট হয়ে উঠবে যে, **মানবতাবাদী মানসিকতাই আজ বিপ্লবভীতির দরুন সর্বহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় অভ্যুত্থান সংগঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানের কারিগরি দিক এবং অধ্যাত্মবাদের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ভিত রচনা করেছে।** দর্শনগত ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে দেখতে গেলে, ফ্যাসিবাদ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ ও বিজ্ঞানের কারিগরি দিকের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ (a peculiar fusion between spiritualism and technological aspects of science)। আর ঠিক এই কারণেই বহু পূর্বেই গান্ধীবাদকে ভারতীয় ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির আদর্শগত ভিত বলে আমি আখ্যা দিয়েছিলাম। সবসময়েই মনে রাখতে হবে, কোন দেশেই ফ্যাসিবাদ রক্ষণশীল বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেনি। কারণ, সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদ গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য বিষয়গুলির (condition) উপস্থিতির সাথে একটি জিনিস সবসময়ই দরকার, তা হচ্ছে উগ্র জাতীয়তার ভিত্তিতে জাতীয় সংহতি সাধন, অর্থাৎ বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে জাতীয় অভ্যুত্থান সংগঠিত করা। একদিকে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা, তার জন্য জাতীয়করণ ও 'প্ল্যানিং' রচনা করা, নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে যথাসাধ্য কমিয়ে আনা এবং 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক ইকনমিক পলিসি' গ্রহণের মারফত ধীরে ধীরে রাষ্ট্র ও একচেটে পুঁজির মিলনের পথে পা বাড়ানো, অর্থাৎ পুঁজিবাদের সামগ্রিক স্বার্থে (aggregate interest of capitalism) রাষ্ট্রকে প্রকৃতপক্ষে একচেটে পুঁজির দাসে

পরিণত করা; অন্যদিকে এইসব কার্যক্রমগুলি নেওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লবের পক্ষে গোটা জাতির ঐক্য সাধন এবং সমাজতন্ত্র ও জাতীয় ঐতিহ্যবাদের মোহজাল বিস্তার করে উগ্র জাতীয়তার বিষ ছড়িয়ে বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর পেছনে সংঘবদ্ধ ভাবে গোটা দেশকে জড়ো করা — একই সাথে এই দু'ধরনের কাজ সম্পন্ন করা বুর্জোয়াশ্রেণীর রক্ষণশীল অংশের পক্ষে অসম্ভব। একাজ একমাত্র বুর্জোয়াদের সেই অংশের দ্বারাই সম্ভব, যাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে প্রগতিশীল বলে আজও একটা মিথ্যা মোহ বর্তমান। মানবতাবাদী জাতীয় বুর্জোয়াদের এই তথাকথিত প্রগতিশীল অংশই রাজনীতিগত ক্ষেত্রে 'ন্যাশনাল সোস্যালিজ্‌ম', 'ডেমোক্র্যাটিক সোস্যালিজ্‌ম' বা 'সোস্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব সোসাইটি', বা 'ন্যাশনাল কমিউনিজম', 'র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিজম্' — এইসব মতবাদের আমদানি করে থাকে। অনুকূল পরিবেশে বুর্জোয়াদের এইসব তথাকথিত ও আপাতদৃষ্ট 'র‍্যাডিক্যাল' মতবাদ এবং প্রোগ্রাম ও স্লোগানের আড়ালে প্রতিবিপ্লবী জাতীয় ঐক্যসাধনের মধ্য দিয়েই সর্বাত্মক ফ্যাসিবাদের জন্ম হয়ে থাকে। এতো গেল, পুঁজিবাদের এই সর্বাত্মক সংকটের দিনে কীভাবে মানবতাবাদীদের এক অংশ, **একদিকে বিজ্ঞানের কারিগরি দিক এবং অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এবং অপরদিকে নীতি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও মূল্যাবোধগুলির সাথে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় ঐতিহ্যবাদের একটা আপসরফা করে ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়ে থাকে** — তার ইতিকথা।

ঠিক এর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে বুর্জোয়া মানবতাবাদের বর্তমান সময়ের আর একটি যে পরিণতি ঘটেছে, তা হচ্ছে, জাঁ-পল-সার্ত্রের 'একজিস্টেনসিয়ালিজম্' বা অস্তিত্ববাদ। খ্রিস্টধর্মীয় মূল্যবোধ বা অন্যান্য ধর্মীয় মূল্যবোধগুলির মতই পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগের বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলিও আজ সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে পড়ার দরুন, বুর্জোয়া মানবতাবাদের এই ধারাটি কোন অবস্থাতেই ধর্ম ও ঐতিহ্যবাদের সাথে আপস করতে রাজি নয়, পুরনো মানসিকতার জের টেনে এই ধারাটি আজও সমস্ত রকমের 'প্রায়রি-ভ্যালু'র ধারণার বিরোধী ; অথচ, এই ধারাটি বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তাধারার প্রভাব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে না পারার ফলে, সমাজে শ্রেণীগুলির উপস্থিতি, বিকাশলাভ ও অবলুপ্তির নিয়ম এবং ভাবজগৎ ও আদর্শবাদের ক্রমবিকাশের নিয়মকে অনুধাবন করতে সক্ষম হল না। তাই এর পক্ষে মানবতাবাদী চিন্তাধারা থেকে সাম্যবাদী চিন্তাধারায় উন্নীত হওয়াও সম্ভব হল না। এই ধারারই পরিণতিতে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের জন্ম। উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতার আড়ালে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ আসলে কিন্তু বুর্জোয়া ভাববাদী চিন্তাধারারই জাবর কেটে চলেছে। আর, এইজন্যই 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' নামে যে বইটি তিনি লিখেছেন, সেই 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস'ই হচ্ছে তাঁর দার্শনিক চিন্তার মূল কথা। যদিও পরবর্তী সময়ে সার্ত্রে নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' অর্থাৎ 'কামিং ইনটু বিয়িং অ্যান্ড গোয়িং আউট অব বিয়িং' — শুধুমাত্র এই ধারণার দ্বারা সমস্ত বস্তুজগতের ক্রিয়াকলাপকে সন্নিবেশিত করে একটা নিয়মানুগ সিস্টেমে (system of discipline) দাঁড় করানো অসম্ভব। তাই বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস তত্ত্বের উপর শত শত পাতার বই লিখে একটি নতুন দর্শন খাড়া করবার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পরে তিনি নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, **দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদই একমাত্র দর্শন যা সামগ্রিকভাবে (comprehensive way) বস্তুজগতের সমস্ত ঘটনাসমূহকে দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্যে অর্থাৎ একই সঙ্গে সংগ্রাম ও ঐক্যের মধ্যে 'স্টাডি' করে একটা 'সিস্টেম অব ডিসিপ্লিন'-এ দাঁড় করাতে সক্ষম।** দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একমাত্র সঠিক দর্শন বলে মেনে নিলেও সার্ত্রে কিন্তু দার্শনিক ফ্যুয়রবাখের মতোই বস্তু থেকে ভাবের উৎপত্তির বাস্তব প্রক্রিয়াটি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই বস্তু ও ভাবের মধ্যে 'প্রায়রিটি'র প্রশ্নে, অর্থাৎ বস্তু থেকেই যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে, এবং বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাধারার বিরোধী বুর্জোয়া ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাপদ্ধতিই অনুসরণ করে চলেছেন। তাই সার্ত্রের পক্ষেও বোঝা সম্ভব হয়নি যে, ভাব হচ্ছে বস্তুর ক্রিয়ার ফল এবং যেকোন ভাবনাধারণা, উপলব্ধি ও আদর্শবাদ হচ্ছে আসলে একটা বিশেষ আদর্শগত পরিমণ্ডল মাত্র যা উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সাথেই একমাত্র জড়িত। ফলে, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিচিন্তা ও ব্যক্তি উপলব্ধিগুলিও যে উৎপাদনের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে বস্তুগত উৎপাদনের উপরিকাঠামো, ভাবগত উৎপাদন মাত্র — এ সত্যও উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফ্যুয়রবাখ এবং সার্ত্রে উভয়েই পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে মানুষের মননশীলতার দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্বীকার করেন। যদিও দুইজনের কেউই চিন্তাশক্তিকে বস্তুবহির্ভূত কোন সত্তা বলে মানেন না, দু'জনেই হেগেলীয় 'অ্যাবসলিউট

আইডিয়া'-র ধারণার বিরোধী, তবু যেকোন চিন্তা আসার পূর্বেই যে তার 'মেটিরিয়াল কনডিশন'গুলি আগে উপস্থিত হয় এবং **এই 'মেটিরিয়াল কনডিশন'-এর সীমাই যে চিন্তার স্বাধীনতার সীমা নির্দেশক** — এ সত্য তাঁরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেননি। বিজ্ঞান ও ইতিহাসের সিদ্ধান্তগুলিকে সাধারণভাবে মেনে নিলেও চিন্তাশক্তির মধ্যে একটা 'অ্যাবসলিউট স্বাধীন সত্তা'র ধারণা ফ্যুয়রবাখ ও সার্ত্রে উভয়েরই মননক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এই কারণেই মানুষের চিন্তায় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব উভয়েই স্বীকার করে নিলেও, এসম্বন্ধে এঁদের উভয়ের ধারণাতেই বুর্জোয়া ভাববাদী চিন্তাপদ্ধতির যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। তাই একই ভাববাদী চিন্তাপদ্ধতি অনুসরণ করে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিকাশের দু'টি ভিন্নতর স্তরে এই দুইজন দুইটি আপাতদৃষ্ট পরস্পরবিরোধী মতবাদের জন্ম দিয়েছেন। তার একটি হচ্ছে, পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগে ফ্যুয়রবাখের 'মানবতাবাদ', আর একটি হচ্ছে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের চরম সংকটের দিনে সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ। পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগে উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে সমাজপ্রগতি ও ব্যক্তির বিকাশের নতুন প্রয়োজনে বস্তুগত উৎপাদনের পরিপূরক যে মনুষ্যত্ববোধের ধারণা ও মূল্যবোধগুলি সমাজচিন্তায় দেখা দিয়েছিল — ফ্যুয়রবাখের মধ্য দিয়ে সেই সমাজচিন্তার ব্যক্তিকরণ-এর ফল তাঁর মানবতাবাদ। কিন্তু তিনি নিজে হেগেলের দ্বন্দ্বমূলক ভাববাদকে অ্যাবসলিউট আইডিয়ার খোলস থেকে মুক্ত করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের কথা বললেও চিন্তার একটা অ্যাবসলিউট স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বের ধারণা থেকে নিজের মননক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে না পারার ফলেই নৈতিকতা ও ন্যায়নীতির প্রশ্নে এইসব মানবতাবাদী মনুষ্যত্ববোধের ধারণা ও মূল্যবোধগুলিকে তিনি একটা শাশ্বত মতবাদে দাঁড় করান। সার্ত্রেও কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে ব্যক্তিমানসের চিন্তার মধ্যে একটা অ্যাবসলিউট স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুর্জোয়া মানবতাবাদী চিন্তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না পারার ফলেই বুঝতে সক্ষম হননি — ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে কীভাবে এবং কেন, অর্থাৎ কোন্ নিয়ম অনুযায়ী একদিনের অত্যন্ত উঁচুদরের মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলিও নিছক অন্ধ বদ্ধমূল মতবাদে (dogma) পরিণত হয়ে আজ শোষকশ্রেণীর হাতে 'প্রিভিলেজ' (সুবিধা)-এ পর্যবসিত হয়েছে এবং যে মানবতাবাদীরা একদিন ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মুক্তির জয়গান গেয়েছে, তারাই কেন আজ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নিছক শাসন ও শোষণের প্রয়োজনে যুক্তিসম্মত বাধানিষেধের (reasonable restriction) দোহাই পেড়ে নানান অছিলায় দিনের পর দিন খর্ব করে চলেছে। সার্ত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তির অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের ধারণা আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে বুর্জোয়াদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা মাত্র। তাঁর **ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা, এমনকী তাঁর 'ফ্রিডম অব চয়েস'-এর ধারণাটিও যে ব্যক্তি সম্পত্তির মানসিকতার সাথে নিগূঢ়ভাবে যুক্ত, অর্থাৎ এসব ধারণাগুলি যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধের জটিল মানসিকতা (private property mental complex) থেকে মুক্ত নয় — এ সত্য তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।** উপরন্তু ব্যক্তি মনস্তত্ত্ব সম্পর্কিত বুর্জোয়া ভাববাদী ধারণাও সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী ধ্যানধারণার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির যে আলাদা একটা সত্তা বা অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে অস্তিত্ববাদীদের মতে এটাই হচ্ছে স্থান-কাল সম্পর্কের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব। এইজন্যই তারা ব্যক্তিসত্তার 'সীমাহীন স্বাধীন অস্তিত্বে' বিশ্বাসী। তাই কোনও একটি ব্যক্তির আচরণের প্রতিক্রিয়া সেই ব্যক্তির উপর বা সমাজের উপর যাই হোক না কেন, তার জন্য ব্যক্তির ফ্রিডম অব চয়েস-এর উপর অর্থাৎ 'ভালো-মন্দ নির্ধারণের ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতা'র উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না। কারণ, সার্ত্রের মতে 'ইন্‌ডিভিজুয়ালস্ আর কন্‌ডেম্‌ড্ টু ফ্রিডম'। ব্যক্তিস্বাধীনতার এরূপ উগ্র ধারণা বা উগ্র স্বাধীনতার ধারণা (ultra sense of freedom) প্রকাশ করার কী অপূর্ব বচনভঙ্গি! কিন্তু এভাবে বলার মধ্যে সাহিত্যিক মূল্য যাই থাকুক না কেন, ব্যক্তিসত্তার এরূপ সীমাহীন স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণা কিন্তু ইতিহাস ও বিজ্ঞানবিরোধী। কারণ সার্ত্রের এরূপ অভিব্যক্তির মধ্যে এই ধারণাটাই ফুটে উঠেছে, যেন 'অ্যান এলিমেন্ট অব ইন্‌টেলেক্ট' (চিন্তার উপাদান) যা বস্তুসৃষ্টও নয়, বস্তুবহির্ভূতও নয়, আবার তা পুরোপুরি বস্তুনির্ভরও নয় — তা অনন্তকাল ধরে বস্তুর মধ্যেই এলিমেন্ট অব ইন্‌টেলেক্ট রূপে নিহিত রয়েছে। সার্ত্রে নিজের মুখে একথা স্বীকার না করলেও, পারিপার্শ্বিকতার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও ব্যক্তিসত্তার এরূপ একটা সীমাহীন স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণা, যা থেকেই তাঁর ফ্রিডম অব চয়েস-এর ধারণা এসেছে — তাকে বিশ্লেষণ করলে শেষপর্যন্ত কিন্তু এই জায়গাতেই এসে দাঁড়াতে হবে। তাছাড়া আর একটি বিষয়ও এর ভেতরে লক্ষ করার আছে, যে সার্ত্রে বুর্জোয়া নৈতিকতা এবং ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে এমন জোরালো ভাষায়

জেহাদ ঘোষণা করেছেন — সেই সার্ত্রেই যখন ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন অস্তিত্বকে বোঝাতে গিয়ে 'ইনডিভিজুয়ালস্ আর কন্‌ডেমড টু ফ্রিডম' — এইভাবে তাঁর ফ্রিডম অব চয়েস-এর ধারণাকে ব্যক্ত করেন, তখন এভাবে বলার ভেতরেই যুক্তি বিচারের যে ধারাটি কাজ করছে, তাও যে আসলে বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থার ন্যায়নীতির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত, আশ্চর্যের বিষয়, এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটা তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। না হলে এ তো তাঁর অজানা থাকার কথা নয় যে, বুর্জোয়া বিচারব্যবস্থার ন্যায়নীতি অনুযায়ীই একটি কাজের জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত (condemned) কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয়বার আর শাস্তি দেওয়া চলে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদী নৈতিকতা ও ন্যায়নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চারে যত জেহাদ ঘোষণা করুন না কেন, বুর্জোয়া বিপ্লব যে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার ধারণার জন্ম দিয়েছিল, সার্ত্রে কিন্তু সেই ব্যক্তিবাদের প্রভাব আজও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদী নৈতিকতা ও মূল্যবোধগুলো আজকের প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে প্রিভিলেজ-এ পর্যবসিত হওয়ার পর সমাজ অভ্যন্তরে শ্রমিকশ্রেণীর পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে কেন্দ্র করে যে নতুন মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে, স্বাধীন অস্তিত্বের বুর্জোয়া ধারণা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে না পারার ফলেই কিন্তু তিনি তা লক্ষ করতে সক্ষম হলেন না। এরই ফলে আজকের যুগে মানবতাবাদীদের কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে ঘা খেয়েই ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে তার মধ্যে উগ্র ধারণার এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পুঁজিবাদী বিপ্লবের সৃষ্টি বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তার এরূপ অধঃপতন দেখে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে ঈশ্বর বিশ্বাস ও শাশ্বতসত্যের ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে যেহেতু সমস্ত রকমের প্রায়রি ভ্যালু-র সমাধি রচিত হয়েছে, সেইহেতু সার্ত্রে মনে করেন, নৈতিকতার প্রশ্নটিই অবান্তর এবং তাঁর কাছে আজ তা অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাই খ্রিস্টীয় ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণার মতোই বুর্জোয়া মানবতাবাদী ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের ধারণাগুলোকেই যে শুধুমাত্র সার্ত্রে ভ্রান্ত মনে করেন তাই নয়, এমনকী এই একই যুক্তির ভিত্তিতে সার্ত্রে মনে করেন, কমিউনিস্ট মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণাও খ্রিস্টীয় ন্যায়নীতির অনুরূপ আর একটি 'ডগ্‌মা' মাত্র। সমস্ত রকম প্রায়রি ভ্যালুর সমাধি রচিত হওয়ার সাথে উৎপাদনের বিকাশের এক একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে সমাজপ্রগতি ও ব্যক্তির বিকাশের যথার্থ প্রয়োজনকে ভিত্তি করে যে নতুন মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণা সৃষ্টি হয়ে চলেছে, তাকে অস্বীকার করার যুক্তি কোথায়? উপরন্তু, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একমাত্র সঠিক দর্শন বলে মেনে নিলে কী হবে — আমি পূর্বেই আলোচনায় দেখিয়েছি যে, কী ধরনের জটিল বস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বস্তু থেকেই প্রথমে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং বস্তু ও ভাবের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সম্বন্ধ কী তা বিচারের প্রশ্নে তিনি কিন্তু বুর্জোয়া ভাববাদী ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করে চলেছেন। এবং 'থিওরি অব রিলেটিভিটি', 'পারটিক্‌ল্‌স থিওরি' এবং 'সায়েন্টিফিক্ ল অব প্রোব্যাবিলিটি' — এইসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোর যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পারার ফলে, **সত্য মাত্রই যে বিশেষ সত্য তা মন থেকে তিনি গ্রহণ করতে পারছেন না।** এবং যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী সব সত্যই আপেক্ষিক সত্য, সেইহেতু বিজ্ঞান পরীক্ষিত বিশেষ সত্য ধারণাগুলির গুরুত্বকে তিনি অযথা ছোট করে দেখছেন এবং বিজ্ঞানের বিশেষ সত্যগুলোকে সাধারণীকরণের (generalisation) মারফত একটি বিশেষ সাধারণ সত্য ধারণা গড়ে তুলবার প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন না। কারণ, তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে যেহেতু সর্বপ্রকার শাশ্বত সত্য ধারণার সমাধি রচিত হয়েছে, সেইহেতু বিজ্ঞানের এই বিশেষ সত্যগুলোর বিশেষ কোনও মূল্য তাঁর কাছে নেই। এইজন্যই তিনি বিশেষ সত্যগুলোর সাধারণীকরণের মারফত একটি বিশেষ সাধারণ সত্য ধারণা গড়ে তুলে উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ স্তরে, অর্থাৎ মানবসভ্যতার বিকাশের এক একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে একটি সাধারণ পথনির্দেশ (general guide to action) গড়ে তোলার কোন প্রয়োজনীয়তাই দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, বিজ্ঞান আবার কী সত্য প্রমাণ করছে ? বিজ্ঞানের সমস্ত সিদ্ধান্তই তো সম্ভাব্য (probable)। তাঁর এরূপ উক্তি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, **আধুনিক বিজ্ঞানের 'ল অব প্রোব্যাবিলিটি' যে কার্যকারণ সম্পর্কবাদের নিয়মের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না, বরং কার্যকারণ সম্পর্কবাদের ধারণাকে 'প্রি-ডিটারমিনিজম'-এর পূর্ব স্থিরীকৃত ধারণা (preconception) থেকে মুক্ত করে আরও স্বচ্ছ এবং বিশদ ব্যাখ্যা (elaborate) করছে মাত্র — এটা তিনি মোটেই বুঝতে পারেননি।** এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও এখানে বলা দরকার, তা হচ্ছে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী

বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুযায়ী বিজ্ঞানের বিশেষ সত্য ধারণাগুলোকে সাধারণীকরণের মারফত যে সাধারণ সত্য ধারণাগুলো গড়ে ওঠে, তাও যে এক একটি বিশেষ অবস্থায় (given condition) সাধারণ সত্যগুলির উপলব্ধির এক একটি বিশেষ পরিমণ্ডলমাত্র — বহু মার্কসবাদী এবং কমিউনিস্টরা আজও তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছেন না। ফলে তাঁরা অনেকেই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই সাধারণ সত্যগুলোকে এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কন্‌সেপশনগুলোকে শাশ্বত সত্য বলে মনে করেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাধারণ সত্যর ধারণা, যেমন, 'থিং ইন দেমসেল্‌ভ্‌স', 'ম্যাটার ইজ এ ফিলোজফিক ক্যাটিগরি', 'একজিসটেন্‌স অব অবজেকটিভ রিয়্যালিটি ইন্‌ডিপেনডেন্ট অব হিউম্যান কনসাসনেস্', 'কন্‌ট্রাডিক্‌শন উইদিন কন্‌ট্রাডিকশন' প্রভৃতি, অথবা বিজ্ঞানের যেকোন সাধারণ সত্য ধারণা, যেমন 'ইনফিনিটি', 'কনজারভেশন অব মাস অ্যান্ড এনার্জি', 'ডিটারমিনিজম্', 'ল অব কজালিটি' প্রভৃতি সাধারণ সত্য (general truth) ধারণাগুলিকে এরা শাশ্বত সত্য বলে মনে করেন। বিজ্ঞানের পরিভাষার উপর সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে সম্প্রতি যে অভিধানটি প্রকাশিত হয়েছে তাতেও ঠিক অনুরূপ বিভ্রান্তিই দেখা যাচ্ছে। তাতে সত্যকে 'অ্যাবসলিউট' এবং 'রিলেটিভ' এই দু'ভাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অথচ, **এইসব সাধারণ সত্যের উপলব্ধিও যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, হয় নিয়ত উন্নত ও বিকশিত হচ্ছে, আর না হয় অবস্থার পরিবর্তনের সাথে তাল রেখে উন্নত করতে বা বিকশিত করতে না পারার ফলে 'ইন্‌অ্যাডিকোয়েট' অর্থাৎ অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। সমস্ত সাধারণ সত্যের উপলব্ধিই এইজন্যই একটা বিদ্যমান বিশেষ পরিস্থিতিতে সাধারণ সত্যের উপলব্ধির একটা বিশেষ ক্যাটিগরি মাত্র। তাই সাধারণ সত্য সম্বন্ধে কোনও একটি বিশেষ ধারণা ও উপলব্ধির ক্যাটিগরি-ই শাশ্বত বা সর্বকালের জন্য নয়।**

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদেরই একটি ভিন্নতর অভিব্যক্তি মাত্র

সার্ত্রে শেষের দিকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে সঠিক দর্শন হিসেবে মেনে নিলেও, ফ্যুয়রবাখের মতই পারিপার্শ্বিকতার সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও ব্যক্তিমানসের একটা অ্যাবসলিউট স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুর্জোয়া ভাববাদী চিন্তাধারার প্রভাবের দরুণ, ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের প্রশ্নটির যথার্থ ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী, তা অনুধাবন করতে সক্ষম হননি। 'অ্যাবসলিউট ফ্রিডম অব চয়েস' — এই মনগড়া ধারণা থেকে তিনি যদি নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারতেন যে, ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে পুঁজিবাদী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থার যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়, সেই বিপ্লবের মধ্যেই রাষ্ট্রের দমনমূলক শাসন এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচার থেকে ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রাম প্রথম সংগঠিত রূপ নেয় এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মুক্তি সম্বন্ধে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবনাধারণাগুলোকে কেন্দ্র করেই মানবতাবাদী মূল্যবোধ ও ভাবাদর্শের জন্ম হয়। তাই বুর্জোয়া বিপ্লব সৃষ্ট মানবতাবাদী ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তির মুক্তির ধারণা কোন অবস্থাতেই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে চিন্তার একটা অ্যাবসলিউট স্বাধীন সত্তার অস্তিত্বের ধারণা থেকে এবং 'প্রাইভেট প্রপার্টি মেন্টাল কমপ্লেক্স' থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তিনি বুঝতে পারতেন, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদের যুগে মানবতাবাদ ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রামের হাতিয়ারের পরিবর্তে আজ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব করার কাজে প্রতিক্রিয়াশীল শোষকশ্রেণীর হাতে প্রিভিলেজ-এ পর্যবসিত হয়েছে এবং বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা ক্রমাগত মিলিটারি ও আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এই নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের যথার্থ সংগ্রাম হচ্ছে, উৎপাদনকে পুঁজিবাদী বজ্রআঁটুনি থেকে মুক্ত করার সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য, অর্থাৎ মানুষের গোটা সংস্কৃতিকে পুঁজিবাদী মুনাফার উদ্দেশ্য এবং পুরনো মানবতাবাদী মূল্যবোধের বন্ধন ও শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার সংগ্রাম। একথা বুঝতে পারলে সার্ত্রে সহজেই ধরতে পারতেন যে, আজ ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম সর্বহারাশ্রেণীর পুঁজিবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রাম তথা সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সাথে ঐতিহাসিক নিয়মেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে। তাহলে বুঝতে পারতেন যে, **বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রচ্যুত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাচ্যুত করার পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সর্বহারা একনায়কত্বের চরম বিজয় অর্জনের সংগ্রাম একই সাথে রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত (wither away) করবার সংগ্রাম এবং রাষ্ট্রের দমনমূলক শাসন থেকে ব্যক্তির সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভের সংগ্রাম।** বুঝতে পারতেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির মুক্তি সংগ্রাম যে নতুন এক ঐতিহাসিক বিশেষ স্তরে পৌঁছেছে সেখানে তার মূল সমস্যাটি আজ আর কোনও শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই

করে স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জনের সমস্যা নয়। এই স্তরে উন্নীত হওয়ার পর **এই সংগ্রামের প্রধান লক্ষ্য ব্যক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের যে বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব তখনও বর্তমান রয়েছে, তাকে মিলনাত্মক দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত করা।** এই সংগ্রামে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে হলে একদিকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতির ক্রমাগত উন্নতিসাধন করার মারফত 'স্মল প্রোডাকশন', 'কমোডিটি সারকুলেশন', 'থিওরি অব ভ্যালু', প্রভৃতি জিনিসগুলির অবলুপ্তির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার পথেই সমাজ অভ্যন্তরে উৎপাদনের প্রাচুর্য সৃষ্টি করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীঅবলুপ্তি ঘটানো এবং অপরদিকে নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বারা ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার বিষয় এবং ধ্যানধারণাগুলিকে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত করে সমাজের মূলগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে। অথচ ব্যক্তি স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার এই স্তরে বুর্জোয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিবাদের পুরনো ধারণাগুলি অভ্যাস ও সংস্কারের রূপে প্রধান বাধা হয়ে দেখা দেয় — যা ব্যক্তির প্রয়োজনবোধের সাথে সামাজিক প্রয়োজনবোধের একাত্মতা (identification) ঘটতে দেয় না। তাই ব্যক্তির স্বাধীনতার সংগ্রামের এই জটিল স্তরে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ বা সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের প্রভাবই ব্যক্তির মুক্তি সংগ্রামের পথে প্রধান বাধাস্বরূপ। **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীঅবলুপ্তি ঘটার পরেও উপরিকাঠামোতে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ, সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ বা সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ, যেরূপেই হোক্ না কেন, ব্যক্তিবাদের অস্তিত্ব যতদিন সমাজ মানসিকতায় থাকবে ততদিন রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি সম্ভব নয়, ফলে ব্যক্তির মুক্তি অর্জনও বিলম্বিত হতে বাধ্য।**

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রের দমনমূলক শাসন ও সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচার থেকে ব্যক্তির মুক্তি অর্জনের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতার সংগ্রামের শুরু, বিকাশলাভ ও অবলুপ্তির ঐতিহাসিক ধারাটিকে সার্ত্রে মোটেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। বুর্জোয়া বিপ্লব যে ব্যক্তিসত্তার, অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণার জন্ম দিয়েছে, বিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদের আজ চূড়ান্ত সংকটের দিনে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে মানবতাবাদীদের কাছ থেকে ঘা খেয়ে সেই ব্যক্তিসত্তার মধ্যে স্বাধীনতা সম্বন্ধে উগ্র ধারণার যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, তার থেকেই সার্ত্রের 'এক্সিস্টেনসিয়ালিজম্', বা অস্তিত্ববাদের জন্ম। একথা সার্ত্রে ধরতে পারলে একথাও বুঝতে পারতেন যে, কেন তিনি নিঃসঙ্গ? সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং পুঁজিবাদী জুলুমের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত মানুষের সংগ্রামের পাশে তিনি যখন একাকী এসে দাঁড়ান, তখন কেন তাঁর 'এক্সিসটেন্সিয়ালিস্ট' শিষ্যদের তাঁর পাশে দেখতে পান না? কেন তাঁর শিষ্যরা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম্-কে একটা 'ভাল্গার প্রিভিলেজ'-এ পরিণত করেছে? কেন তারা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াসী এবং ক্রমশ 'ইগোসেন্ট্রিক' এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে? আসলে সার্ত্রের এক্সিস্টেনসিয়ালিজম্ বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদেরই একটি ভিন্নতর অভিব্যক্তি মাত্র এবং এই কারণেই তা আজকের পরিস্থিতিতে অবশ্যম্ভাবীরূপে সংগ্রামের হাতিয়ার হওয়ার পরিবর্তে প্রিভিলেজ-এ পর্যবসিত হতে বাধ্য।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব সত্ত্বেও ব্যক্তির চিন্তার মধ্যে একটা সীমাহীন (absolute) স্বাধীনতার ধারণা, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেও ব্যক্তিসত্তার একটা স্বাধীন অস্তিত্বের ধারণা, বুর্জোয়া ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মুক্তি প্রভৃতি নিয়ে মানবতাবাদ একটা বিশেষ আদর্শগত ক্যাটিগরি মাত্র — যা পুঁজিবাদী বিপ্লব কর্তৃক সৃষ্ট এবং যা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে **কোনও অবস্থাতেই মানবতাবাদী মানসিকতা যে ব্যক্তি সম্পত্তিবোধের মানসিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে** না — এই সত্য মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোকে সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। এই কারণেই মার্কস সমাজে শ্রেণীসংগ্রামের আবির্ভাব, বিকাশ ও অবলুপ্তির নিয়ম এবং মানুষের ভাবজগৎ ও আদর্শবাদের ক্রমবিকাশের নিয়মকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে কেন্দ্র করে পুঁজিবাদী সমাজ অভ্যন্তরেই সম্পূর্ণ নতুন যে ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণা গড়ে উঠেছে মার্কসের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিকরণ ঘটার ফলেই সাম্যবাদ বা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের ধারণার জন্ম হয়। তাই একসময় মার্কসকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, কমিউনিজমও তো হিউম্যানিজম্, তাহলে তিনি একে হিউম্যানিজম্ না বলে কমিউনিজম্ বলছেন কেন। মার্কস এর উত্তরে যা বলেছিলেন, তার মর্মার্থ হল, ব্যক্তিসম্পত্তি বিযুক্ত মানবতাবাদই হচ্ছে সাম্যবাদ (Communism is humanism minus private property*)।[২] এরূপ উক্তির দ্বারা মার্কস যে নিয়ম অনুযায়ী মানবতাবাদের ধারাবাহিকতার পরিণতিতে সাম্যবাদের জন্ম হয়েছে তা দেখাতে

চেয়েছেন, অর্থাৎ একটি থেকে আর একটির আবির্ভাব হলেও সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেও যে একটি ছেদ রয়েছে — যা এই দুইটি মতবাদকে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং যা এই দু'টি মতবাদেরই আবির্ভাবের পেছনে উৎপাদনের বিকাশের দুইটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরকে নির্দেশ করছে, তা বোঝাতে চেয়েছেন।

এখন, এইসব আলোচনা থেকে আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নিযুক্ত কর্মীদের ওপর আজ কতটা গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে। আর, এ দায়িত্ব পালন করতে হলে আপনাদের যে কথাটি সবসময়ই মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, দেশের শ্রমিকশ্রেণী সহ আপামর শোষিত জনসাধারণ কঠোর শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত থাকলেও নানা ধরনের বুর্জোয়া ভাবধারার প্রভাব থেকে তারা আজ মোটেই মুক্ত নয়। **বুর্জোয়া ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ধারণাগুলি নানারূপে বিশেষ করে অভ্যাসের ও সংস্কারের রূপে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নিযুক্ত অনেক নেতা ও কর্মীদের মননক্রিয়ায় আজও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে।** ফলে, আজ পদে পদে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামে নানান বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকেও তা বিপথগামী করে তুলেছে। উগ্র বস্তুতান্ত্রিকতার মুখোশ পরে এবং বিপ্লবী বুলির আড়ালে কতরকম ভাবেই না বুর্জোয়া মানবতাবাদ ও বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের প্রভাব শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে কাজ করছে। যেমন, আজকাল মার্কসবাদী, এমনকী কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দেন এমন বহু রাজনৈতিক দলের প্রতিপত্তিশালী নেতাদেরও খোলাখুলিভাবে বলতে শোনা যাচ্ছে — নৈতিকতা আবার কী? নৈতিকতার ধারণা তো একটা বুর্জোয়া ভাববাদী ধারণা মাত্র! মার্কসবাদ এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নাকি সর্বপ্রকার নৈতিকতার ধারণার বিরোধী! দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও মার্কসবাদের কী অপূর্ব উপলব্ধি! এইসব তথাকথিত চিন্তানায়কদের হাতে পড়ে মার্কসবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কী করুণ পরিণতি! এইসব তথাকথিত বিপ্লবীদের এই ধরনের উক্তি এবং তদনুরূপ আচরণ এইটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে যে, বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ আজ প্রিভিলেজ-এ পরিণত হয়েছে এবং সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ এদের অজ্ঞাতসারেই এদের মননক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। আজ মার্কসবাদী ও কমিউনিস্টদের একাংশের এরূপ চিন্তা ও আচরণের ফলে শ্রমিক আন্দোলন ও সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলির মেরুদণ্ডে ভেতর থেকে কুঠারাঘাত করা হচ্ছে। এর বিষাক্ত প্রভাব থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে বাঁচাতে হলে এর বিরুদ্ধে আপনাদের তীব্র কষাঘাত চালাতে হবে।

ব্যক্তি সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু নয়

আবার নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেন এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা ব্যক্তিকে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন। অথচ ইতিহাস, বিজ্ঞান, দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোন সিদ্ধান্তেই ব্যক্তি দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু নয়। ব্যক্তিকে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু মনে করলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ জপতে জপতেই শেষপর্যন্ত হয় গান্ধীবাদ, না হয় সার্ত্রের ব্যক্তিতত্ত্বের খপ্পরে গিয়ে পড়তে হবে। তাই আমাদের সর্বদা **মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিসত্তা সামাজিক দ্বন্দ্ব সংঘাতগুলির কেন্দ্রবিন্দু নয় বরং ঠিক তার উল্টো। উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে একটি বিশেষ সমাজের অভ্যন্তরে নানান পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহের দ্বন্দ্বসংঘাতগুলোর মধ্যে সব সময়ই দুটো মূল বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব বর্তমান — যেটাই হচ্ছে সেই সমাজের মূল দ্বন্দ্ব (principal contradiction)। আর, এই মূল দ্বন্দ্বের প্রধান দিকই (principal aspect) হ'ল সেই সমাজের সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলোর কেন্দ্রবিন্দু। এই মূল দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করেই সমাজের অন্যান্য সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতগুলো আবর্তিত হচ্ছে এবং ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তার নিত্যনতুনরূপে আবির্ভাব ঘটছে।**

ব্যক্তিকে দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু মনে করার ফলে আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনে দু'ধরনের বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে, এমনকী দলের আভ্যন্তরীণ সংগ্রামের ক্ষেত্রেও অনেকে কমিউনিস্ট তক্‌মার আড়ালে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ ও বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণাগুলিকেই আজও লালন-পালন করে চলেছেন। ফলে, এ জিনিস পার্টির অভ্যন্তরে ব্যক্তির প্রয়োজন ও পার্টির প্রয়োজনের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলার সংগ্রামে কার্যত নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। **দলের অভ্যন্তরে উগ্র গণতন্ত্র ও উদার গণতন্ত্রের যুক্তিজালের আড়ালে বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকলে গণসংগ্রাম ও বিপ্লবী**

সংগ্রামের জোয়ারের সময়, অর্থাৎ যতক্ষণ বিপ্লবের একটা টগবগে ভাব থাকে ততক্ষণ এর বিষময় প্রভাবের তেমন বহিঃপ্রকাশ দেখা না দিলেও, সংগ্রামের স্তিমিত অবস্থায় এবং নৈরাশ্যের পরিবেশে এর ভয়াবহ ও বিষময় প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দিতে বাধ্য। তীব্র ও নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার মধ্য দিয়ে এই চিন্তাধারা ও ব্যক্তিবাদী ঝোঁককে আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করতে না পারি, তাহলে দলের অভ্যন্তরে এই ব্যক্তিবাদের অস্তিত্ব, এমনকী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও নানারূপে বারে বারে আত্মপ্রকাশ করবে এবং নানা বিপত্তির সৃষ্টি করবে।

অপর একটি বিচ্যুতি যা এই ভ্রান্ত চিন্তাপদ্ধতির প্রভাবে ঘটতে দেখা যাচ্ছে, তা হল, একদল মনে করছেন, কমিউনিস্ট আন্দোলনে আজ যে ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার মূল কারণ কমিউনিস্টদের নিষ্ঠার সাথে লেনিনীয় আচরণবিধি অনুসরণ করে না চলা। তাই, এরা মনে করেন, একদল সাচ্চা কমিউনিস্ট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যারা কমিউনিস্ট হতে চায়, সর্বপ্রথম তাদের লেনিনীয় আচরণবিধি অনুসরণ করে চলার অভ্যাস করতে হবে। এরা বুঝতেই পারছেন না যে, সমাজ অভ্যন্তরে বুর্জোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বই যেখানে আজ মূল দ্বন্দ্ব হিসাবে দেখা দিয়েছে, সেখানে এই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শ্রমিক, চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্তদের প্রতিদিন প্রতিনিয়ত যে সংগ্রামগুলো গড়ে উঠছে — ভুল হোক্, শুদ্ধ হোক্ — শ্রমিকশ্রেণীর সেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে লেনিনীয় আচরণবিধিগুলি সঠিকভাবে অনুসরণ করে চলার অভ্যাস আয়ত্ত করা সম্ভবই নয়। শ্রমিকশ্রেণীর এই আন্দোলনগুলোর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থেকেই সঠিক সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী এগুলিকে পরিচালনা করার জন্য যে সংগ্রাম তার সাথে লেনিনীয় আচরণবিধি আয়ত্ত করার সংগ্রামকে ঠিকভাবে সংযোজিত করতে পারলেই লেনিনীয় আচরণবিধিগুলির বিশেষ বিশেষ সংগ্রামের স্তরে যথার্থ তাৎপর্য কী, তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং একমাত্র এই পথেই লেনিনীয় আচরণবিধিগুলো অনুসরণ করে চলার অভ্যাস একজন আয়ত্ত করতে পারেন। লেনিনের এই আচরণবিধিগুলো যে আচরণবাদ নয়, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যেই যে এর সত্যোপলব্ধি নিত্যনতুনরূপে প্রতিভাত হচ্ছে — এ সত্য বুঝতে না পারার ফলেই, যেহেতু এদের মতে আন্দোলনের নেতৃত্ব সঠিক নয় সেইহেতু এরা শ্রমিক-চাষীর সংগ্রামগুলোকেই অপ্রয়োজনীয় সংগ্রাম বলে মনে করছেন এবং এই সংগ্রাম থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে রেখে, 'লেনিনীয় পদ্ধতিতে'(?) একদল 'সাচ্চা বিপ্লবী' তৈরি করার নামে আসলে এক ধরনের আচরণসর্বস্ব ব্যক্তিবাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন।

সর্বহারার ক্লেদাক্ত জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি সর্বহারা সংস্কৃতি নয়

প্রগতিশীল এবং সর্বহারা সংস্কৃতি চর্চার নামে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে চেহারা দেখছি, তাতে আর একটি কথাও না বলে পারছি না। তা হচ্ছে, শ্রমিক, চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্তদের উপর মালিকগোষ্ঠী ও জোতদারদের ভয়াবহ অত্যাচারের ঘটনাগুলিকে করুণ কাহিনী হিসাবে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে পারলেই যে সর্বহারা বিপ্লবী সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া যায় না, আজ একথা ভালোভাবে বোঝার সময় এসেছে। পুঁজিবাদী শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট এবং সবদিক দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমিক, চাষী ও নিম্নমধ্যবিত্ত বস্তিবাসীদের দৈনন্দিন ক্লেদাক্ত জীবনযাত্রা হুবহু ফুটিয়ে তোলা, অর্থাৎ তার হুবহু প্রতিচ্ছবিও সর্বহারা সংস্কৃতি নয়। বিপ্লবী সর্বহারা সংস্কৃতির কথা যাঁরা বলছেন, তাঁদের প্রথমেই বোঝা দরকার, আমাদের দেশের সর্বহারাশ্রেণীর বিন্যাস কী? দুনিয়ার সমস্ত পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোর মতই আমাদের দেশেও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে তিনটে ভাগ রয়েছে। একদল যাদের সঙ্গে গ্রামীণ চাষীজীবনের আজও পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি। মজুরের এই অংশ চাষীজীবনের নানা কুসংস্কার, কুঅভ্যাস, ধর্মীয় অন্ধতা ও গোঁড়ামি প্রভৃতি গ্রাম্য অভ্যাসগুলো শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে আমদানি করছে। মজুরশ্রেণীর দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে, যারা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলি থেকে অর্থনৈতিক শোষণের চাপে ধীরে ধীরে বস্তিবাসী ও মজুরে পরিণত হয়েছে। অর্থনীতির দিক থেকে মজুরশ্রেণীতে পরিণত হলেও ভাবগত ও রুচিগত দিক থেকে মধ্যবিত্ত বাবু সমাজের সঙ্গে এদের সম্পর্ক আজও একেবারে চুকে যায়নি। মজুরশ্রেণীর এই অংশই শ্রমিক আন্দোলনে পেটিবুর্জোয়া ভাববিলাসিতা ও দোদুল্যমানতা, ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ, আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিবাদ, উদারনীতিবাদ, অর্থনীতিবাদ ও সমস্ত রকমের সুবিধাবাদী মানসিকতা আমদানি করে থাকে। সর্বশেষ যে অংশ, এদের শহরের মধ্যবিত্ত বাবু সমাজ ও গ্রামীণ চাষী সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে

চুকে গিয়েছে। আমাদের দেশে এরা সংখ্যায় অল্প হলেও সর্বহারশ্রেণীর মধ্যে এরাই সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ — কাজে কাজেই সবচেয়ে বেপরোয়া (desparate)। কিন্তু, যতদিন পর্যন্ত না এরা যথার্থ শ্রেণীসচেতন হয়, অর্থাৎ বিপ্লবী চেতনা এদের মধ্যে গড়ে ওঠে, মনে রাখতে হবে, ততদিন এই বেপরোয়াভাব (desperateness) কিন্তু উদ্দেশ্যহীন, এবং আজ সমাজে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদের যে নোংরা পরিণতি ঘটেছে, তার প্রভাবও এদের মধ্যে পুরোমাত্রায় বর্তমান। এই তিনটি অংশের ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার পারস্পরিক দ্বন্দ্বই হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। কিন্তু গোটা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে পুঁজিপতিশ্রেণীর প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে যে মরণপণ সংগ্রাম চলেছে, তাই হচ্ছে আজকের সমাজের মূল দ্বন্দ্ব। এই মূল দ্বন্দ্বই ক্রমাগত শ্রমিকশ্রেণীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রভাবিতকরে চলেছে। এখানে সর্বদা মনে রাখতে হবে, প্রতিদিনকার শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য থেকে শ্রমিকদের ভেতরে সমাজতান্ত্রিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শ, সর্বহারাশ্রেণীর রাজনীতিটা আপনাআপনি জন্ম নেয় না। এই চেতনা বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয় (comes from without), অর্থাৎ এই চেতনা আয়ত্ত করার সংগ্রাম একটা আলাদা সংগ্রাম। আর, এই কারণেই একমাত্র সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতির প্রভাব বাড়িয়েই শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার যে প্রভাব আজও বর্তমান রয়েছে তা ভাঙতে হবে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে নতুন বিপ্লবী চেতনা, মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণা গড়ে তুলতে হবে। এজন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের এ দিকটা চোখ খোলা রেখে ভালোভাবে লক্ষ করতে হবে এবং ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে হবে। আর, এ কাজ করতে হলে ঘরে বসে সংস্কৃতির চর্চা করলে বা শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে ভাসাভাসাভাবে যুক্ত থাকলেও চলবে না। সর্বহারাশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী রাজনীতিকে চিনে নিয়ে, সেই রাজনীতির ভিত্তিতে শোষিতশ্রেণীর যে বিপ্লবী আন্দোলনগুলো পরিচালিত হচ্ছে, সেই আন্দোলনগুলোর সাথে নিজেদের জড়িত করা এবং সেই বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা, কর্মী ও জনসাধারণের সাথে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সংযোগসাধন একান্ত দরকার। কারণ, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে সর্বহারার এই বিপ্লবী রাজনৈতিক মতবাদের অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়েই একমাত্র সর্বহারাশ্রেণী এই নতুন মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণাগুলির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক বিপ্লবী রাজনীতির সাথে নিজেদের যুক্ত করতে পারলে একমাত্র তখনই আপনারা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, **সর্বহারাশ্রেণীর এইসব বিপ্লবী ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার ধারণাগুলো বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম যুগে বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধের একদিন যে সর্বোচ্চ মান গড়ে উঠেছিল — তার চাইতে কত উন্নত, মহৎ ও কত সুন্দর।**

সর্বহারার সঠিক বিপ্লবী আন্দোলন এদেশে যতটুকু গড়ে উঠেছে, তার সাথে সংযোগ না থাকার ফলে, একদল সর্বহারা সংস্কৃতির নামে আসলে অতীতের মানবতাবাদীদের মতই শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট ও পর্যুদস্ত সর্বহারার ক্লেদাক্ত জীবনের ছবি এবং মালিকগোষ্ঠী ও জোতদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-চাষীর দৈনন্দিন সংগ্রামের হুবহু প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা এবং তারই মধ্যে কিছু কিছু বিপ্লবী বক্তৃতাবাজি করাকেই সর্বহারার বিপ্লবী সংস্কৃতি বলে মনে করছেন। এর দ্বারা সর্বহারা ও শোষিত জনসাধারণের প্রতি বড়জোর মানবতাবাদী দরদের চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো চলতে পারে, কিন্তু সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দেওয়া যায় না। সর্বহারার প্রতি মানবতাবাদীদের এরূপ অনুকম্পা ও অনুগ্রহকে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রমিকমাত্রই ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। তাছাড়া, এরা এও বুঝতে পারছেন না যে, এভাবে এদের জীবনযাত্রা ও দৈনন্দিন সংগ্রামগুলোর হুবহু প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে আসলে এরা বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা — যা সর্বহারার মধ্যে আজও বর্তমান রয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর সংস্কৃতির নামে সেই ভাবধারা, মূল্যবোধ ও রুচিকেই প্রকাশ করছেন মাত্র। এরই ফলে এদের মৌল রচনাগুলি রুচিগতভাবে রেনেশাঁর বুর্জোয়া মানবতাবাদী সংস্কৃতির স্তর পার হয়ে নতুন স্তরে উন্নীত হওয়া তো দূরের কথা, তার চেয়েও নিম্নমানের হয়ে পড়ছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝান্ডা ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন

তাহলে দেখা যাচ্ছে, **মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলি নিঃশেষিত হওয়ার পথেই সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম।** তাই আজ আর শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রশস্তি গাইলেই চলবে না। এঁদের সাহিত্যচিন্তার মুখ্য শ্রেণীচরিত্র নির্ণয় করে, সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁদের মূল্যায়ন করার যে প্রয়োজন রয়েছে — সে

ব্যাপারে জনসাধারণকে আপনাদের সাহায্য করতে হবে। রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রভৃতিরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে স্তরে স্তরে যে উন্নত পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, ঠিক সেইখান থেকে আপনাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুরু। ঠিক সেইখান থেকেই হবে সর্বহারা সংস্কৃতির জয়যাত্রার শুরু। এর সাথে কিন্তু আর একটা কথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এদেশের বুর্জোয়া মানবতাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই যে দুটো ধারার কথা আমি আগেই বলেছি — **তার মধ্যে মূলত মানবতাবাদের আপসহীন যৌবনোদ্দীপ্ত ও বিপ্লবাত্মক ধারাটি — যে ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন শরৎচন্দ্র ও নজরুল — তারই ধারাবাহিকতায় ও তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম।** আজ আপনারা, যারা যথার্থ অর্থে শরৎচন্দ্র ও নজরুলের উত্তরসাধক হতে চান, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই শরৎচিন্তা ও নজরুল চিন্তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাদের চিন্তার একটা বিরোধ দেখা দিতে বাধ্য। আজকের সর্বহারা সংস্কৃতির উদ্‌গাতারা শরৎচন্দ্র ও নজরুলেরই উত্তরাধিকারী। আর, উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হওয়ার মানেই যাঁদের উত্তরাধিকারী তাঁদের সঙ্গে আপনাদের চিন্তাগত বিরোধ ঘটবে। যারা পরিবর্তিত অবস্থাতেও শুধু সেই পুরনো চিন্তারই জাবর কেটে চলেছে, তারা তাঁদের উত্তরাধিকারী তো নয়ই, উপরন্তু এইসব স্তাবকেরা তাঁদের যে সংস্কৃতি একদিন লড়াইয়ের হাতিয়ার ছিল, তাকে আজ প্রিভিলেজে পর্যবসিত করেছে। তাহলে আজ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামনে প্রধান কাজ হচ্ছে, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে ঝান্ডাটি রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের তাড়াহুড়ায় অবহেলায় ফেলে দিলেন, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল যাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন — এবং যে ঝান্ডাটি গণতন্ত্রীরা, সমাজতন্ত্রীরা ও মেকি সাম্যবাদীরা ভোটের রাজনীতিতে অসুবিধা হতে পারে এই ভয়ে আজও অবহেলায় ফেলে রেখেছেন, সেই ভূলুণ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝান্ডাটিকে আজ আপনাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং ক্রমাগত জ্ঞানের আলোকে তাকে আরও উদ্ভাসিত করতে হবে। 'বিশুদ্ধ সংস্কৃতি'র চর্চা ও সর্বপ্রকার বুর্জোয়া ভাবধারার আক্রমণকে প্রতিহত করে আপনারা যদি এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বহারা বিপ্লবের পরিপূরক এমন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশে গড়ে তুলতে পারেন, তবেই আপনারা হবেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল সংস্কৃতির সত্যিকারের উত্তরসাধক। তবেই জাতীয় জীবনে আজ যে নৈতিকতার সংকট, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আজ যে জড়তা, তা দূর হবে। আপনারা নির্ভয়ে এগিয়ে চলুন — শেষ জয় আপনাদেরই। এইখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

১ পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়, যিনি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

২ মার্কসের ভাষায় ''...Communism is humanism mediated with itself through the supersession of private property''. (*Economic & Philosophic Manuscripts of 1844, Moscow, 1977, P-157*)

১৯৬৯ সালের ২৬ মে কাজি নজরুল ইসলামের
৭০তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে 'পথিকৃৎ'
সাংস্কৃতিক সংস্থা আয়োজিত এক সভায় প্রদত্ত ভাষণ।
এটি পথিকৃৎ প্রকাশিত একটি পুস্তকে
১৯৭০ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়।